আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬

শহীদ দিবস
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২০১৬

MARTYRS' DAY

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2016

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৫ মার্চ ২০০১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন। সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ আনান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

ফে ব্রু য়া রি

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬

স্মরণিকা

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ | ৯ ফাল্গুন ১৪২২

সম্পাদক : অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী

নির্বাহী সম্পাদক : শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম

স্মরণিকা উপকমিটি

১. শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ), আমাই	আহ্বায়ক
২. বেগম আকতার কামাল, চেয়ারপার্সন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪. মোঃ মনজুরুর রহমান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫. ইফফত আরা নাসরীন মজিদ, পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইন্‌স্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬. মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, উপপরিচালক (উপসচিব), আমাই	সদস্য
৭. মোঃ শামসুল আলম, সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮. মোঃ মনজুরুল হক, উপপরিচালক (পাবলিসিটি, জাদুঘর ও লাইব্রেরি), আমাই	সদস্যসচিব

স্বত্ব: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুদ্রণ: এলিয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা

আবুল বরকত : শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত বিএ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

রফিকউদ্দিন আহমদ : শহীদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহীদ রফিক বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় তিনজন ছাত্র মারা গেছে। শহীদ রফিকের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহীদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

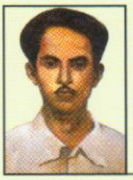

শফিউর রহমান : ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কোন্নগর গ্রামে শহীদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকায় চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহীদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরি করতেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল বলে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা সম্ভব হয়।

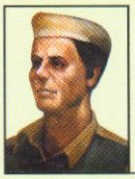

আবদুল জব্বার : শহীদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায়। প্রায় বারো বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন; বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। শহীদ আবদুল জব্বারের পাকিস্তানের প্রতি ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাহিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহীদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে যারা শহীদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

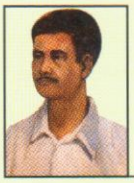

আবদুস সালাম : শহীদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহীদ আবদুস সালাম দাগনভূঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর চাকরির সন্ধানে ঢাকা এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র-জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহীদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। সেই বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্তানে দাফন করা হয়েছিল।

আবদুল আউয়াল : শহীদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহীদ হন ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ২৬ বছর। পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিলা ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড।

অহিউল্লাহ : শহীদ অহিউল্লাহ ৮/৯ বছরের বালক। অহিউল্লাহর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশায় রাজমিস্ত্রী। ১৩৬২ সনের ১১ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন, গুলি লাগে তাঁর মাথায়। পুলিশ অতি দ্রুত তাঁর লাশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয় এবং গায়েব করে দেয়।

a
ā
i
ī
u
ū
e
ai
o
ka
kha
ga
gha
na
ca
cha
ja
jha
ña
ṭa
ṭha
ḍa
ḍha
ṇa
ta
tha
da
dha
na
pa
pha
ba
bha
ma
ya
ra
la
ḷa
va
śa
sa
sa
ha

ব্রাহ্মী লিপি

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
বাংলাদেশ প্রতিনিধি, ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ড

বাণী

আমাদের সব স্মৃতি পলাশের তমালের মেধা
বুকভর্তি কৃষ্ণচূড়া, আলপথে অভয়ের বাণী
রুদ্র পলাশের দিনে শহীদের সব ছায়াতরু
দিগন্তরেখার পাশে আমাদের বিজয় সরণি

একুশ আমাদের অহংকার। একুশ আমাদের ভালোবাসা। আত্মত্যাগের রক্তাক্ত মহিমায় উদ্ভাসিত একুশে ফেব্রুয়ারি আজ সারা পৃথিবীতে সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতীক-দিবসে পরিণত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই সারা পৃথিবীতে বাঙালির গৌরবের অসাধারণ দিন।

পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার ভাষা আছে। বলা হয় প্রতি পনের দিনে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে বিপন্ন হয়ে পড়ছে বহু ভাষা। ভাষার মৃত্যু মানে সভ্যতার মৃত্যু। ভাষার মৃত্যু মানে একটি জাতিগোষ্ঠীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু। ভাষার মর্যাদা তাই সমুন্নত রাখতে হবে। ভাষাকে রক্ষা করতে হবে বিলুপ্তির হাত থেকে, বিপন্নতার হাত থেকে। এই জন্য প্রয়োজন সকলের সমন্বিত উদ্যোগ।

ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় ও অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আজ ইউনেস্কো'র ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এ আমাদের জন্য বিরল সৌভাগ্য। এ গৌরব ও মর্যাদাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের কাজে আরো গতিশীলতা আনতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ প্রতিষ্ঠান স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারে সেজন্য গবেষণা ও মাতৃভাষাচর্চার ক্ষেত্রে নতুন নতুন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হবে ভাষার বিকাশ ও সংরক্ষণের অনন্য এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তাহলেই একুশের অমর শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি আমরা যথাযথ সম্মান দেখাতে পারবো।

আমি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

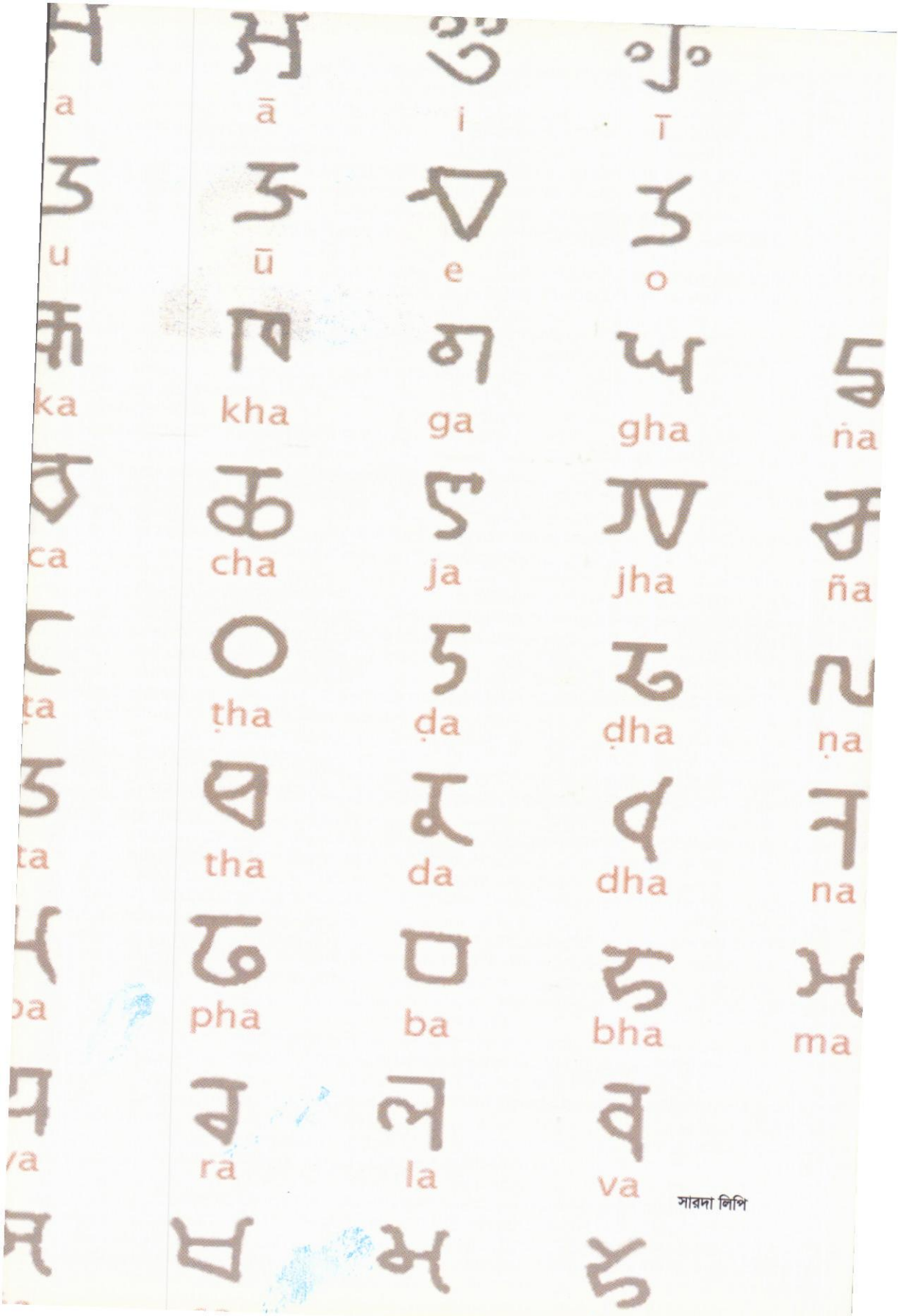
a
ā
i
ī
u
ū
e
o
ka
kha
ga
gha
ṅa
ca
cha
ja
jha
ña
ṭa
ṭha
ḍa
ḍha
ṇa
ta
tha
da
dha
na
pa
pha
ba
bha
ma
ya
ra
la
va

সারদা লিপি

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউট একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ-উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ধাবমান পৃথিবী। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটে চলেছি আমরা, লক্ষ্য একটাই– আমাদের চারপাশের পরিবেশ-প্রতিবেশ তথা মানুষের সার্বিক কল্যাণ, উন্নয়ন। আজকের পৃথিবীতে উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম ভাষা। ভাষা মানেই গণসংযোগ। আর যোগাযোগ মানেই উন্নয়ন। ভাষাহীন একটি পৃথিবীর কথা ভাবুন। কারো মুখে ভাষা নেই, সবাই নির্বাক। কেউ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। সব কাজ, সব উন্নয়ন বন্ধ হয়ে আছে। এমন একটা পৃথিবী আজ ভাবাই যায় না। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, ভাষা একটি জাতির সবটুকু আবেগ, তার হৃদয়ানুভূতির চিত্রলেখাও বটে।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে নিজের ভাষাটা যে কতো আপন, গুরুত্বপূর্ণ– ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি জাতি তা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

কাজেই ভাষার সংরক্ষণ, তার উন্নয়ন ও বিকাশসাধন আজকের যুগে আমাদের দৈনন্দিন ব্রত বা কর্তব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হওয়া জরুরি। কেননা আমরাই বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর মূল প্রণোদনা। শহীদের লাল তাজা রক্তে কেনা বাঙালির 'একুশে ফেব্রুয়ারি' আজ বিশ্বজনের মাতৃভাষা দিবস। বস্তুত একুশের মূলমন্ত্র, বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের চেতনাকে ধারণ করেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটের সৃষ্টি। এর আঙ্গিনা হোক তাই বিশ্বজনের ও সকল ভাষা-ভাষীর মেধা ও মনন চর্চার উন্মুক্ত আঙ্গিনা।

পরিশেষে, ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হোক– এই প্রত্যাশা করছি।

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

মায়া লিপি

Head and Representative

UNESCO Office, Dhaka

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Message

It was the strong initiative of Bangladesh that International Mother Language Day (IMLD) was proclaimed both by UNESCO in 1999 and by the UN General Assembly in 2008. Since then, every year on 21 February the day is celebrated all over the world to promote linguistic diversity. The theme of the International Mother Language Day 2016 is "Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes".

The United Nations as a whole has a mission to promote linguistic diversity and multilingualism. By its mandate, UNESCO attaches great importance to the preservation and utilization of languages as the most important tool for communication and the means to transmit and preserve the cultural diversity of the world. In recognition of the importance of language, all sectors of UNESCO, education, the sciences, culture and communication have developed language related programmes.

UNESCO Director-General, Ms. Irina Bokova, reminds us this year on the occasion of International Mother Language Day 2016, that "Mother languages in a multilingual approach are essential components of quality education, which is itself the foundation for empowering women and men and their societies. We must recognise and nurture this power, in order to leave no one behind, to craft a more just and sustainable future for all."

UNESCO appreciates the ongoing efforts and commitment of the Government of Bangladesh in the cause of international mother language which is expressed with the establishment of the International Mother Language Institute (IMLI) in Dhaka under the auspices of UNESCO (Category 2 institute) to promote the right to education, linguistic diversity, cultural pluralism and understanding. To observe the International Mother Language Day 2016, IMLI is organizing three inter-connected events – an opening ceremony, an international seminar and a national seminar.

Beatrice Kaldun

(Beatrice Kaldun)

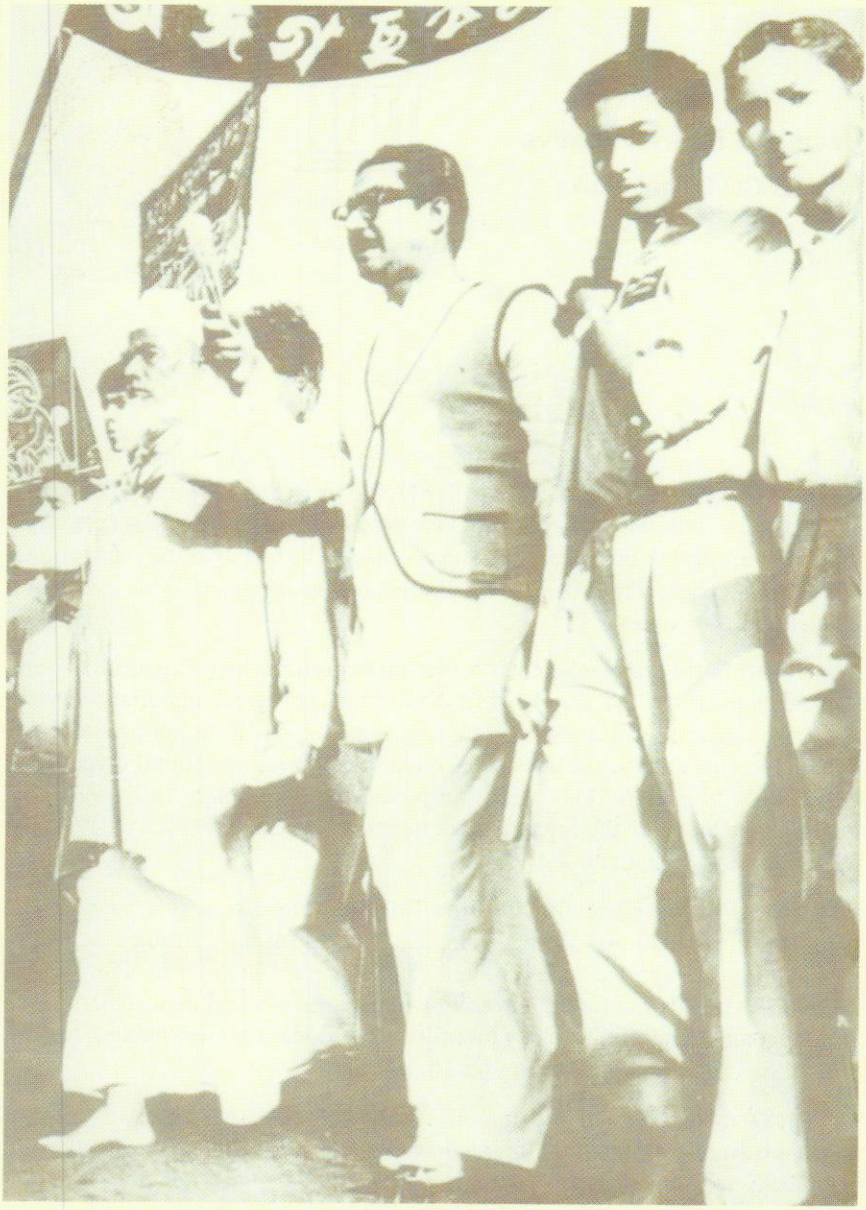

মাতৃভাষার অপমান
কোন জাতি সহ্য করতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভাষা ও ভাষাশহীদ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু

(একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণের চুম্বক অংশ)

"১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না, বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।"

"মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।"

(১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত)

"তাই আজ আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি, জীবনে মানুষ পয়দা হয় মৃত্যুর জন্য। বেঁচে আছি এতো একটা এক্সিডেন্ট। আজ ঘুরছি কালই মরে যেতে পারি। যারা মরে গেছে তারা পথ দেখিয়ে গেছেন। যারা শহীদ হবেন তারাও পথ দেখিয়ে যাবেন, ভবিষ্যৎ বংশধর– তারা বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে দুনিয়া ছেড়ে বলতে পারবে– আমি বাঙ্গালী, আমি মানুষ, আমার স্বাধিকার আছে, আমার অধিকার আছে। তাই আজকে শহীদ দিবসে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ঘরে ঘরে আপনারা দুর্গ গড়ে তুলুন। আমরা সকলের সহানুভূতি-ভালোবাসা চাই। কারো বিরুদ্ধে আমাদের হিংসা নাই। কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের উপর শক্তি ব্যবহার করতে চায়– নিশ্চয়ই এদেশের মানুষ আর সহ্য করবে না। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল যতদিন পর্যন্ত বাংলা থাকবে, বাংলার আকাশ থাকবে, বাংলার মাটি থাকবে– বাংলার মাটিতে মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা একুশের শহীদদের কথা কেউ ভুলতে পারব না। কারণ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না,...। এ আন্দোলনে আমিও জড়িত ছিলাম। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে আমি গ্রেফতার

হয়ে জেলে যাই। ১৯৫২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনশন ধর্মঘট করি আর আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি, তারা একুশ থেকে আন্দোলন শুরু করবে। ২৭ তারিখে আমাকে বের করে দেওয়া হয় জেল থেকে। আমি মরে যদি যাই জেলের বাইরে যেন মরি। এই আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম, আজো জড়িত আছি। জানি না কতদিন থাকতে পারব। আমি প্রস্তুত আছি, তবে আপনাদের কাছে আমার বলার এইটুকু রইল যে, এই বাংলা যেন আর অপমানিত না হয়। আর এই শহীদ যারা হয়ে গেছে তাদের রক্তের সাথে বেঈমানি যেন আমরা না করি।"

(১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসে প্রদত্ত)

"আমরা আজ শহীদ দিবস পালন করছি, লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। খেয়াল রাখবেন এই স্বাধীনতা যেন বৃথা না যায়। আজ যে আদর্শের জন্য আমার ভাইরা শহীদ হয়েছিল সে আদর্শ সেদিন পূরণ হবে, যেদিন বাংলাদেশের মানুষ শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে পারবে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল যে, আজ প্রতিজ্ঞা করুন, যে পর্যন্ত না শোষণমুক্ত সমাজ গঠন না হবে, সে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। আমাদের চারটি আদর্শ। এই চারটি আদর্শ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র– যে পর্যন্ত আমরা এই চারটা স্তম্ভের উপর গঠন করত না পারব, সে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।"

"আমার দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা আজও চেষ্টা করছে আমার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য। মনে রাখবেন ষড়যন্ত্র বন্ধ হয় নাই। আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। দল-মত নির্বিশেষে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক একাত্মবোধ হয়ে দেশ গঠনের কাজে অগ্রসর হন। আমার দেশের মানুষ দুখী, না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আপনাদের সরকারের এমন কিছু নাই মানুষকে পেটভরে ভাত দেবার পারে। আপনারা গ্রামে গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে এগিয়ে যান এবং দেশের মানুষকে সুখী করেন। সেদিন এই শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে। বাংলার মানুষ পেটভরে ভাত খাবে। সুখে-শান্তিতে বাস করবে। বেকার সমস্যা দূর হবে। ছাত্ররা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। সেজন্য বলছি আমি, শহীদ স্মৃতি অমর হউক। জয় বাংলা।"

(১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় প্রদত্ত)

উৎস: *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ*, প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড
সম্পাদনা ড. এ এইচ খান ও অন্যান্য

একুশে ফেব্রুয়ারি: বাঙালির মননের বাতিঘর

আতিউর রহমান*

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের একইসঙ্গে বেদনা ও গৌরবের এক দিন। এই মহান দিবসে ফি-বছর বাঙালির জীবনে ফিরে আসে নবজীবনের ডাক। একুশে ডাক দিয়ে যায় স্বদেশি চেতনার, উদ্দীপনের, উজ্জীবনের। একুশে আমাদের সাহসের প্রতীক। একুশে আমাদের মননের বাতিঘর। একুশে নানা মাত্রিকতায় মহিমান্বিত করেছে বাঙালি জাতিকে। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য বাঙালির রক্তে রচিত হয়েছে যে ইতিহাস, সেটিই বাঙালির মাথা নত না করার চিরকালীন প্রেরণা হয়ে রয়েছে। মাতৃভাষা বাংলার জন্য রচিত একুশের এই সোপান আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে এবং ইউনেস্কোর সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী সকল ভাষা গোষ্ঠীর মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠেছে।

ভাষা জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ভাষা মানুষের অস্তিত্বকে ধারণ এবং প্রাণোদ্দীপ্ত করে। জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, জাতিগঠন কিংবা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা বিকাশে সাধারণ একটি ভাষার রয়েছে অসাধারণ গুরুত্ব। সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্টনি গিডিন্‌স মনে করেন, "জাতীয়তাবাদ মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ব্যাপার।" আর ভাষা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চেতনার বাহন। ভাষা কারো একার সম্পত্তি নয়; ভাষা সকলের। মাতৃভাষা শুধু মানুষের মুখের ভাষা নয়, অস্তিত্বেরও অংশ। মাতৃভাষাকে বাদ দিলে জাতির পরিচয় গৌণ হয়ে যায়। শিকড়-ছিন্ন বৃক্ষের মতো দুর্বল হয়ে যায়। মাতৃভাষাকে আঁকড়ে ধরেই জাতির পথচলা। ভাষা অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকারও মাধ্যম। উৎপাদনের সঙ্গে ভাষার রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। সকল মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম বলে ভাষার কোনো শ্রেণি নেই। তাই মানুষকে সেই যোগাযোগের মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করা মানেই উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তখন মানুষ বস্তুগতভাবে টিকে থাকার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মানুষ তখন মনে করে তার বেঁচে থাকার নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। আর সে কারণেই মানুষ সংগ্রামে নামে সেই নিরাপত্তাকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য।

*গবেষক ও অর্থনীতিবিদ

একই ভাষায় কথা বলার অর্থ হচ্ছে একে অন্যের ভাবনার শরিক হওয়া। অন্য গোষ্ঠী বা জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা ও আচরণের সন্ধান পায় মানুষ এই ভাষার মাধ্যমেই। মায়ের ভাষাকে কোনোভাবেই অবরুদ্ধ করা যায় না। ধ্বংস করাও সম্ভবপর নয়। মাতৃভাষার জন্য প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী সর্বদা বদ্ধপরিকর। মাতৃভাষার ওপর আঘাত এলে মানুষের আত্মাভিমানে লাগে। মানুষ স্বভাবসুলভ বিদ্রোহ করে। এজন্যই মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আসীন করতে বাঙালি রক্ত দিয়েছে, করেছে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ– যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। অন্য ভাষাভাষীদেরও ভাষার প্রতি রয়েছে একই ধরনের ভালোবাসা। তাই প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের দাবি সার্বজনীন আবেগের সৃষ্টি করে। এ দাবি ন্যায়সঙ্গতও বটে।

১৯৪৮ সালে করাচিতে নবগঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভার শুরুতেই উর্দু ও ইংরেজিকে গণপরিষদের সরকারি ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। এই সভায় পূর্ববাংলার গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু-ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। এ সময় তিনি সরকারি কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের জন্যও একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সব এবং পূর্ববাংলার কিছু সদস্য এক জোটে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। পূর্ববাংলায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে ছাত্রসমাজের প্রতিবাদী পদক্ষেপে ঢাকার রাজপথ সরগরম হয়ে ওঠে। ঢাকার বাইরের ছাত্র-ছাত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৮-এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম ছাত্রলীগের এক যৌথসভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নাম দেওয়া হয়। এই সভায় বাংলা ভাষার দাবিতে ৭ মার্চ ঢাকায় এবং ১১ মার্চ সারাদেশে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাষা সৈনিক গাজীউল হকের ভাষায়, "১১ মার্চের ধর্মঘট পূর্ববাংলার সবকটি জেলায় সবকটি শহরে ছড়িয়ে পড়ে।" ১১ মার্চ ধর্মঘট পালনকালে সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটে পিকেটিং করার সময় শামসুল হক, অলি আহাদ এবং অন্যান্যের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন– যা ছিল ভাষা আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ। ১৫ মার্চ মুক্তি পাওয়ার পরপরই শেখ মুজিব ফজলুল হক হলে আসেন। সেখানে ইতোমধ্যেই সম্পাদিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আট দফা চুক্তি পড়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, "মিয়ারা করছে কি? রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি কোথায়? এই চুক্তি আমি মানি না।" শেখ মুজিবের বক্তব্য– আট দফা চুক্তি ছিল অন্তঃসারশূন্য। এই চুক্তিতে রাষ্ট্রভাষার দাবিকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপোস করেছেন কিছু আপোসকামী ছাত্রনেতা। আট দফা চুক্তি এবং সংশোধনী পাশাপাশি পড়লেই চুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা এবং আপোসকারীদের আপোসকামিতা প্রকট হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে শেখ মুজিবের প্রস্তাব মতো ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে এবং সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি স্থান সংশোধন করে সেই সংশোধিত প্রস্তাব সাধারণ ছাত্রসভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বেলা দেড়টায় শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে সাধারণ ছাত্রসভায় আট দফা চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রসমাজ সশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। সেদিন সভা শেষে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিষদ ভবন ঘেরাও করা হয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আট দফা চুক্তির ফলে মিইয়ে যাওয়া ভাষা আন্দোলনকে সেদিন শেখ মুজিব এককভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ঢাকায় ভুখা মিছিল এবং কঠোর ভাষায় সরকারের সমালোচনা করার দায়ে গ্রেফতার করা হয় নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত তিনি জেলে ছিলেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন যখন আরো জোরদার হয়, তখন জেলে থেকেও শেখ মুজিব এইপর্বে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। নানা পরামর্শ দিয়ে আন্দোলনকে নিয়মিতভাবে প্রভাবান্বিত করেন। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে বন্দি থাকার কারণে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তিনি আন্দোলনকে বেগবান করতে নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এই সময় শেখ মুজিবকে চিকিৎসার জন্য জেল থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে সংবাদ পাঠান, ২১ ফেব্রুয়ারি যেহেতু পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হবে, সেইহেতু সেদিন দেশব্যাপী হরতাল ডেকে ব্যবস্থাপক সভা ঘেরাও করা যায় কি-না, তা বিবেচনা করে দেখতে। ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সমাবেশ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হলো। তাই ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয়।

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'অনেকেই ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আপনাদের জানা দরকার। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি, রাষ্ট্রভাষার ওপর ও আমার দেশের ওপর যে আঘাত হয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি তার মোকাবেলা করতে হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। একথা আজ বলতে পারি: কারণ, আজ পুলিশ কর্মচারীর চাকরি যাবে না। সরকারি কর্মচারীর চাকরি যাবে না। কথা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করবো, আর ২১ তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। ....অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের।'(আতিউর রহমান, 'শেখ মুজিব, বাংলাদেশের আরেক নাম', পৃ. ১৬৫)

একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। বিকাল চারটায় পরিষদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচির মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে শহীদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিকসহ অনেকে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেমে পড়েন। শুরু হয় পৃথিবী-তোলপাড় করা আন্দোলন। সরকার শেষপর্যন্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এরপর একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করতে পূর্বপাকিস্তানে গড়ে ওঠে অসংখ্য শহীদ মিনার।

ভাষা আন্দোলন মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য সূচিত হলেও এর মূল চেতনাটি ছিল আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের কাঙ্ক্ষিত আশাভঙ্গের কারণে প্রথম সফল বিদ্রোহ। এ সময়ই পূর্বপাকিস্তানের কৃষক-সন্তান, মধ্যবিত্ত তরুণেরা পাকিস্তান ধারণাটির কবর রচনা করে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বহুমাত্রিক এক নয়া রাষ্ট্রচিন্তার বীজ বপন করে। ফলে দ্রুত বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। বাংলার জনগণ বুঝতে সক্ষম হয় তারা আর কখনোই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারবে না। তাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে বড় চাকরি করতে, ব্যবসা করতে কিংবা শিল্প গড়তে পারবে না। তাই শাসকদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হলে আন্দোলন, সংগ্রাম করেই করতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারির পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। বাঙালি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে মূলত ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই। তারা বুঝতে পারে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা বৈষম্যের শিকার। সেই বৈষম্য চরম আকার ধারণ করলে স্বাধীনতার দাবি ওঠে।

ভাষা আন্দোলন থেকেই গড়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন থেকেই দানা বাঁধে মুক্তিযুদ্ধ। এই আন্দোলনের প্রতিটি বাঁকে শেখ মুজিবের সুদৃঢ় নেতৃত্ব সদা দৃশ্যমান। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট অধিকার সচেতনতার প্রতিফলন দেখা যায় চুয়ান্নর নির্বাচনে। এ নির্বাচনে বাঙালি নেতাদের 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুল বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালির এই গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে সহ্য করতে পারেনি। তারা বাঙালির গণতান্ত্রিক বিজয়কে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই শেখ মুজিবের তেজোদ্দীপ্ত নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে সামরিক স্বৈরাচার এবং শোষণ-বঞ্চনা বিরোধী আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর নেতৃত্ব বাঙালির প্রাণে শক্তি ও সাহস যোগায়। ভাষা আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ঐতিহাসিক ছয় দফা, ছাত্রসমাজের এগারো দফার সংগ্রাম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাবিরোধী আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে জনতার রায়, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন– এভাবে ধাপে ধাপে পরিণতি লাভ করে একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম। আর মুক্তিসংগ্রাম শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের

সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে সগৌরবে উৎকীর্ণ হয়– "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"।

মাতৃভাষা বাংলার জন্য আমাদের আত্মত্যাগের স্মৃতিকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দিয়েছে। এই স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনেও যুক্ত রয়েছে আরেক রফিক ও সালামের নাম, যেমনটি গেঁথে আছে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গেও। ১৯৯৮ সালে কানাডার ভ্যানকুভার শহরে বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'দ্যা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' সংগঠনের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের আবেদন জানান জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে। পরে বিষয়টি বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেককে অবহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করলে তিনি এ বিষয়ে খুবই উৎসাহিত হন এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর এই দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণের ফলেই প্রস্তাবটি যথাসময়ে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পাঠানো সম্ভব হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরের বছর ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকেই এ দিবসটি জাতিসংঘের প্রায় সব দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর শুধু বাংলা ভাষাভাষী মানুষের শোকার্ত দিন নয়। গোটা বিশ্বের মাতৃভাষা দিবস। এর ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি অর্জন করেছে। এটা আমাদের জন্য গৌরবের। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। এ স্বীকৃতি তাঁদের গৌরবগাথা, তাঁদেরই বিজয়।

বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ছয়-সাত হাজার। এসব ভাষার অনেকগুলোরই নিজস্ব বর্ণমালা নেই। আবার অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে কিংবা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমাদের দেশে বাংলা ছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার অধিকার সুরক্ষার সংকল্পদীপ্ত দিবস। তারুণ্যের জাগরণও একুশে ফেব্রুয়ারিকে উদ্ভাসিত করেছে নতুন মাত্রায়। বাংলা মায়ের তরুণ সন্তানেরা রক্তের আল্পনা এঁকে যে ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই মাতৃভাষার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, এর চর্চা, বিকাশ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের গৌরবময় অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

মাতৃভাষার সুরক্ষা, বিকাশ এবং এর অবাধ চর্চার অধিকার ছাড়া কোনো জাতির অগ্রসরতার পথ প্রশস্ত হতে পারে না। এর মানে এই নয় যে, মানুষ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিখবে না বা চর্চা করবে না। বিশ্বায়নের এই যুগে এমনটি চিন্তাও করা যায় না। সেই কারণে আমাদের সাহিত্য যেমন বিদেশের ভাষায় অনূদিত হতে হবে, তেমনি অন্য দেশের সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হতে হবে। এভাবেই আমরা বিশ্বসাহিত্যের

সঙ্গে আমাদের সাহিত্যকে সংযুক্ত রাখতে সক্ষম হবো। তাছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ভাষাও শিখতে হবে বৈকি! বাংলাকে অগ্রাহ্য করে বিদেশি ভাষায় কথা বলে স্মার্ট হওয়া যাবে না। হালে উল্টাপাল্টা ভুল শব্দের সংমিশ্রণ আমাদের দেশীয় ভাষাকে চরমভাবে বিকৃত করছে। এভাবে বিকৃত হতে থাকলে প্রকৃত বাংলা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাহলে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ মূল্যহীন হয়ে যাবে।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদেরই মুখের ভাষা। আসুন, আমরা আগে সুষ্ঠু ও শুদ্ধভাবে বাংলা বলি, লিখি। তারপর অন্য বিদেশি ভাষার ওপর গুরুত্ব দিই। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বিকাশেও আমাদের সদাসচেতন থাকতে হবে। বাংলা ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য একটি গবেষণা তহবিল গড়ে তোলা খুবই জরুরি। সরকার গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল থেকে এই 'ঘূর্ণায়নমূলক তহবিল' (এনডাউমেন্ট ফান্ড) গড়তে উদ্যোগী হতে পারেন। ব্যাংকিং ও অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেও এ ধরনের তহবিলে অবদান রাখতে পারে।

আসুন, সবাই মিলেই আমরা মাতৃভাষার উন্নয়নে ব্রতী হই।

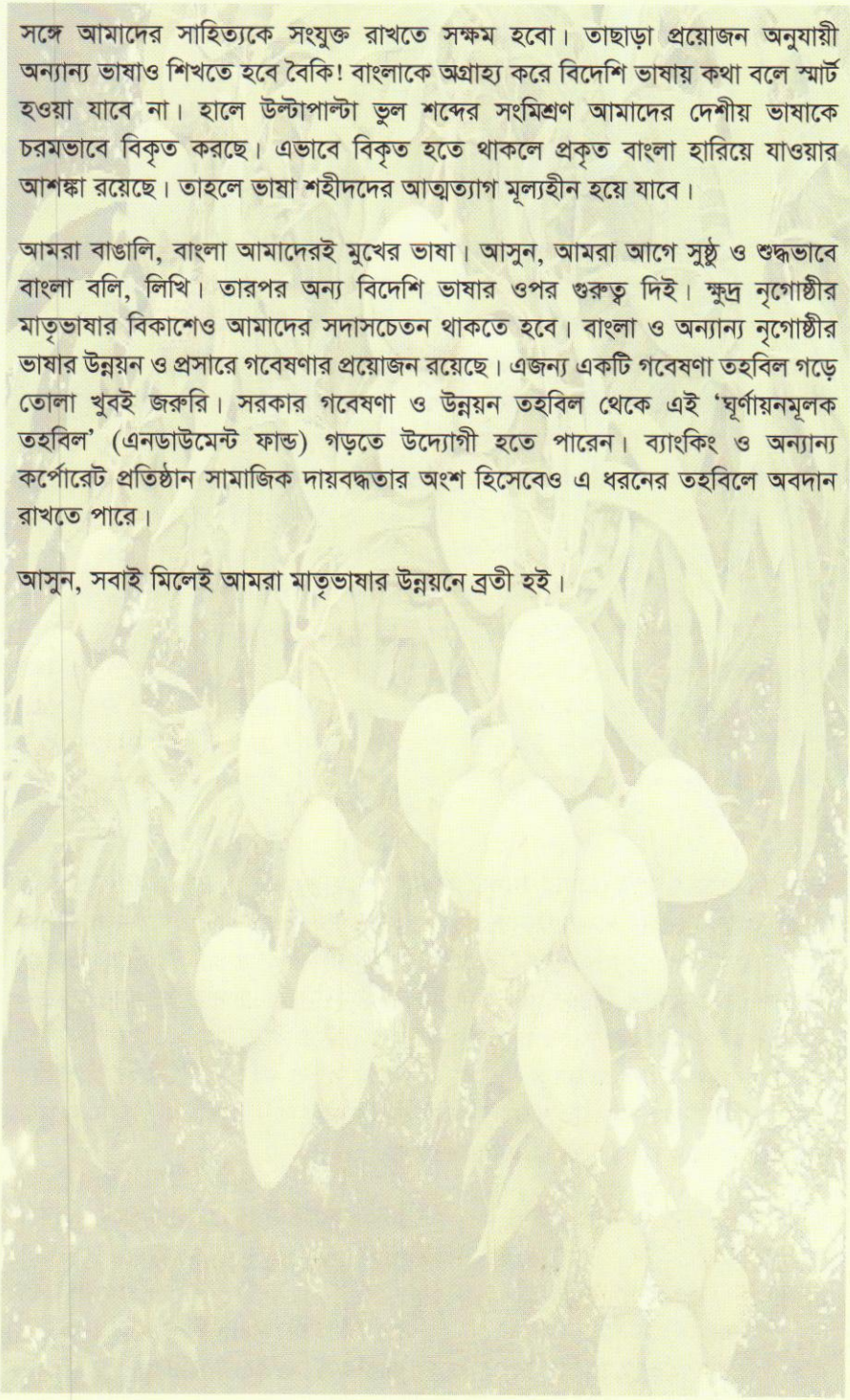

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী*

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের ১৯৭তম অধিবেশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইউনেস্কোর জেনারেল কনফারেন্সের ৩৮তম অধিবেশনে এই ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশের জন্যে এ এক অসাধারণ ও অভূতপূর্ব অর্জন। বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্বে ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

একুশ আমাদের অহঙ্কার, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের অস্তিত্বের বাতিঘর। ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় মহিমায় একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজ বিশ্বব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে যা আমাদের গৌরবের মহিমাকে আরো সমুন্নত করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিক ও সময়োচিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সম্ভব হয়েছে এই অর্জন। কানাডা-প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে আরেক বাংলাভাষী আবদুস সালামসহ সাত ভাষার মোট দশজন ভাষাপ্রেমীর উদ্যোগে গঠিত দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অভ দ্য ওয়ার্ল্ড-এর মাধ্যমে প্রাথমিক এ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু এ ধরনের প্রস্তাব রাষ্ট্রের মাধ্যমে উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৯৯ সালের ০৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর দূরদৃষ্টিতে ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন এ ধরনের প্রস্তাবের গুরুত্ব। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ-প্রস্তাব ইউনেস্কোতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ফলে বাংলাদেশের জন্য যে ঐতিহাসিক লগ্ন এসেছিল ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সভায়, সে শুভলগ্ন অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর চির-অক্ষয় হয়ে থাকলো বাংলাদেশের অর্জনের সঙ্গে। আমরা পেলাম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্বের সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের মহান দায়িত্ব এসে পড়ে বাংলাদেশের ওপরে।

*সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি, ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাই-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ২০০১ সালের ১৫ মার্চ। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তিত হলে তখনকার বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে আমাই নির্মাণ প্রকল্পের কাজ। নিষ্ফলা সময় বয়ে যায় সাতটি বছর ধরে। এরপর ২০০৮ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় সরকার গঠন করলে আমাই নির্মাণ প্রকল্প আবার প্রাণ ফিরে পায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কাজ এগিয়ে চলে। ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাই-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। একই বছরের ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন সংসদে পাস হয়– একে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়ে। শুরু হয় আমাই-এর অগ্রযাত্রা।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালের ১০ অক্টোবর আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-এরও মহাসচিব। তখন আমি আমাই প্রকল্প ও বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হই। ইতোমধ্যে আমাই-কে ইউনেস্কোর ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশে ইউনেস্কো কার্যক্রমের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-ই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম ধারণা প্রদান করে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরবর্তীকালে ২০১১ সালে ইউনেস্কোতে প্রস্তাবনা প্রেরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যাতে বিএনসিইউ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। প্রসঙ্গত, ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার কার্যক্রমে ইউনেস্কোর পাঁচটি অধিক্ষেত্র, যথা– শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং যোগাযোগ ও তথ্য) এর যে-কোনো একটির সম্পৃক্ততা থাকবে এবং যার গভর্নিং বডিতে ইউনেস্কো মহাপরিচালকের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হবেন। ইউনেস্কো এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বাজেট কিংবা কর্মসূচি কোনোটিতেই সরাসরি অংশগ্রহণ করে না। তবে ইউনেস্কো এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য দাতা সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। এই ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। একটি চমৎকার ভাষা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে চলছে নৃ-ভাষার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ইনস্টিটিউটে আসেন। তাঁর উপস্থিতি এই

ইনস্টিটিউটের জন্যে আলাদা রকমের উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিএনসিইউ'র চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.'র তত্ত্বাবধানে খসড়া প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণের নিমিত্ত তৈরি হয় ২০১৩ সালের মার্চ মাসে। প্রস্তাবটি ১৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালনা বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১১ জুলাই ২০১৩ তারিখে প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়।

প্রস্তাবটি প্রেরণের পর ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এম. শহীদুল ইসলাম এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগ রেখে ইতিবাচক ফলাফল আনয়নের জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রথম সেক্রেটারি ফারহানা আহমেদ চৌধুরীও বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এখানে উল্লেখ্য, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বাংলাদেশের একজন সুহৃদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তাঁর রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সেটি তিনি ইউনেস্কোর বিভিন্ন সভায় বহুবার উল্লেখ করেছেন। ইতোমধ্যে ২০১৪ সালের ০৮ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'শান্তিবৃক্ষ' (Tree of Peace) পুরস্কারে ভূষিত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ২০১৪-১৭ মেয়াদের জন্য আমাকে ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন। বিভিন্ন সময়ে ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণের সময় আমি বাংলাদেশের প্রতি মিজ ইরিনা বোকোভার আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখেছি।

ইউনেস্কো মহাপরিচালকের নির্দেশে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি প্রতিনিধিদল (ফিজিবিলিটি স্টাডি টিম) ঢাকায় আসে ২০১৪ সালের ০১ নভেম্বর। উক্ত প্রতিনিধি দলে ছিলেন ভাষা ও শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক পরামর্শক পলিন জি. জিতে এবং ইউনেস্কো ব্যাংকক অফিসের শিক্ষাবিষয়ক প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট মিন বাহাদুর বিস্তা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং ইউনেস্কো কমিশনের সচিব মোঃ মনজুর হোসেন এর তত্ত্বাবধানে প্রতিনিধিদল গত ২-৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি., প্রফেসর ইমেরিটাস আনিসুজ্জামান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বাংলা একাডেমির

মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান, ইউনিভার্সিটি অভ লিবারেল আর্টস অব বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমানসহ ব্র্যাক, সিল (SIL), ক্যাম্পে (CAMPE) ইত্যাদি এনজিওর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সচিবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদল ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা আমার দপ্তরে আমার সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদল কর্তৃক ইতিবাচক প্রতিবেদন দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনেস্কো মহাপরিচালক বিষয়টি ১৯৭তম ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের সচিবালয় থেকে উক্ত বোর্ডসভায় উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া রেজ্যুলুশন প্রস্তুত করে বাংলাদেশের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ০৭ জুন ২০১৫ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে জরুরিভিত্তিতে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে কিছু সংশোধনী এনে রেজ্যুলুশনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়।

০৮ জুন ২০১৫ তারিখে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিক বিষয়টি অবহিত করি এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তাবিত রেজ্যুলুশন অনুমোদন করেন, যার ফলে ১৯৭তম সভায় এটি উপস্থাপন করার পথ সুগম হয়।

উক্ত বোর্ডসভায় আমার নেতৃত্বে ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এম. শহীদুল ইসলাম এবং বিএনসিইউ'র সচিব জনাব মোঃ মনজুর হোসেনসহ ছয় সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। ৮-২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো'র ১৯৭তম নির্বাহী বোর্ডসভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে ইউনেস্কো নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

Establishment in Dhaka, Bangladesh, of an international mother language institute

The Executive Board,

1. Recalling the revised integrated comprehensive strategy for category 2 institutes and centres under the auspices of UNESCO as approved by the General Conference in 37 C/Resolution 93,
2. Taking note of the important contributions of category 2 institutes and centres to UNESCO's programme priorities and their potential international or regional impact,

3. Recognizing the importance of quality education based on mother language education,

4. Having examined document 197 EX/16 Part II containing the proposal of Bangladesh to establish in Dhaka, Bangladesh an international mother language institute (IMLI) as an institute under the auspices of UNESCO (category 2),

5. Welcomes the proposal of Bangladesh to establish in Dhaka, Bangladesh, an international mother language institute (IMLI) as an institute under the auspices of UNESCO (category 2);

6. Takes note of the observations and conclusions of the feasibility study contained in document 197 EX/16 Part II;

7. Deems the considerations and proposals contained in document 197 EX/16 Part II to be such as to meet the requirements needed to establish an institute under the auspices of UNESCO (category 2);

8. Recommends that the General Conference, at its 38th session, approve the establishment in Dhaka, Bangladesh, of the International Mother Language Institute (IMLI) as an institute under the auspices of UNESCO (category 2), and that it authorize the Director-General to sign the corresponding agreement.

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৮তম অধিবেশনে কোনো বিতর্ক ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক কমিশনে এবং পরে প্লেনারিতে বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাধারণ সভার ৩৮তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-এর চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.। এ অধিবেশনের শেষে ১৬-১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত লিডার্স ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অংশগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কোর মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এম. শহীদুল ইসলাম। বলাবাহুল্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এখন বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পৃথিবীর যে-কোনো মাতৃভাষার সংরক্ষণ, বিকাশ এবং তার ওপর গবেষণাকার্য পরিচালনার ম্যান্ডেট পেল। এত বড় পরিসরে কাজের সুযোগ বাংলাদেশের খুব কম প্রতিষ্ঠানই অর্জন করতে পেরেছে। এ এক নতুন মাইলফলক

বাংলাদেশের জন্য।

সুতরাং দায়িত্বও অনেক। আজ আমাদের কাজ করতে হবে দেশের মর্যাদা সমুন্নত করার অভিপ্রায়ে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত রাখার লক্ষ্যে।

নৈঃশব্দ্যের ভাষা

পবিত্র সরকার

১ কথা মানুষের, নৈঃশব্দ্যও মানুষের

কেউ নিষেধ করলেও এবং চুপ করে থাকার কোনো গুরুতর কারণ না থাকলে, কথা না বলে আপনারা থাকতে পারবেন না। কেউ বলতেই পারেন, গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, আপনারা দশ বছর মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখুন। পুলিশের গাড়ি থেকে বেরোবার বা তাতে ঢোকবার সময় মাননীয় সাংসদ এবং আসামি কিছু বলতে চাইলে পুলিশ গাড়ির দেয়াল চাপড়ে হল্লা করে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, সুমহান ভারতীয় (অন্যান্য দেশের) নির্বাচন ব্যবস্থায় নানাভাবে গণতন্ত্রের 'কণ্ঠরোধ'ও হতেই পারে। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র কবিতায় কেরোসিন শিখা মাটির প্রদীপকে বলেছিল, 'ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে'। অন্যদের উপর নৈঃশব্দ্য চাপানোর এ সব পেশিচর্চা ও আস্ফালন তো আছেই।

পেশিচর্চার চেয়ে ভয়ংকর কিছুও আছে। কথাকে ভয় করে অনেকে, অনেক গোষ্ঠী। মানুষকে হত্যা করে নৈঃশব্দ্য চাপানো বীভৎস প্রকল্পে তাদের দ্বিধা নেই, যেমন প্রমাণিত হয়েছে দাভোলকার, পানসার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান, অনন্ত বিজয় দাস, নীল নিলয় এবং আরও অনেকের হত্যায়। মানবতার শত্রুরা নৈঃশব্দ্য কেনার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে, গুপ্ত ও প্রকাশ্য হত্যা ও হিংস্রতার আশ্রয় নেয়, সে তো আমরা সকলেই জানি। ধর্ষিতাদের পরিজনকে, বা দল-গুন্ডার হাতে নিহতের ভাইকে চাকরির লোভ দেখিয়ে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে, তাদের নৈঃশব্দ্য ক্রয় করা হয়।

আমাদের রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় লোকে নৈঃশব্দ্য কেনে, নৈঃশব্দ্য বিক্রিও করে। ক্রেতা থাকলেই তো বিক্রেতা থাকবে। 'আমি কিছু দেখিনি, শুনিনি'–এ কথা বলা এক ধরনের বিক্রয়যোগ্য নৈঃশব্দ্য– তার বৈষয়িক মূল্য কম নয়। যে সব লোক সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না, যারা অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে যায় না, তারা অলীক নিরাপত্তার মূল্যে নৈঃশব্দ্য বিক্রি করে।

*সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার মনের কথাকে বদলে দেওয়ার চেষ্টাও চলে। চম্‌স্কি যাকে বলেন manufacturing consent, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন এবং সংবাদমাধ্যম নানাভাবে করে চলে বলে তাঁর ধারণা, তাও আপনার নিজের কথা বলবার অধিকারকে কেড়ে নিতে চায়, আপনার মুখে অন্যদের মনোমতো কথা বসিয়ে তা-ই আপনাকে দিয়ে বলাতে চায়। এও এক ধরনের আরোপ, নৈঃশব্দ্য আরোপের মতোই। এটা আরোপিত নৈঃশব্দ্যের চেয়েও ভয়ংকর, কারণ চুপ করে থাকলে হয়তো আপনি কিছুটা শান্তি পেতেন, কিন্তু আপনি যে কথা বলতে চান না তা যখন আপনার মুখ দিয়ে বলানো হয় তখন আপনার নিজের সঙ্গে একটা লড়াই তৈরি হয়ে যায়।

কিন্তু নিজের কথা তবু আপনাকে বলতেই হবে। তার কারণ আর কিছুই না, আপনি পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যে কথা বলতে পারে, আপনি homo loquens। 'ভাষা' বলতে আমরা বুঝি, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি জুড়ে অর্থ ও নানা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা, অন্য কোনো প্রাণীর সেই ক্ষমতাই নেই। আপনি যেহেতু মানুষ, কথা বলার যন্ত্র আপনার মস্তিষ্কের বাঁদিকে বসানোই আছে, ব্রোকা আর ভেরনিকের এলাকায়। তাই অতি শৈশব থেকেই কথা বলা আয়ত্ত করা আপনার একটা প্রধান কাজ, আপনাকে তিন সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে সেটাকে সেরে ফেলতে হবে। পণ্ডিতেরা বলেন, জন্মের আগে থেকেই কথা শুনতে (শিশুরা মায়ের পেটে সাত মাস বয়স থেকেই নাকি মায়ের কথার স্বর চিনতে পারে), এবং জন্মের পরে সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই গড়গড় করে কথা বলতে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। প্রতিটি স্বাভাবিক মানবশিশু তাই করে। প্রথম প্রথম নৈঃশব্দ্য সে ভাঙে কান্না দিয়ে, তার পর কু-কু আওয়াজ (cooing), তার পরে কলধ্বনি (babbling) পর্বগুলি আসে পর্যায়ক্রমে। এক বছর নাগাদ তার এক-শব্দের বাক্য বলা আরম্ভ হয়ে যাবে, দেড় বছরে পৌঁছাবে দুই-শব্দের বাক্যে। কিন্তু আমরা লক্ষ করব, কথার চৌকাঠে যখন শিশু পৌঁছেছে, মুখে তার কোনো শব্দ ফোটেনি তখন সে অকারণেই নানা বিচিত্র আওয়াজ করতে থাকে। তার কোনো উদ্দেশ্য নেই, তা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য নয়, যেন কথার ধ্বনি নিয়ে সে খেলা করছে–শুধু নৈঃশব্দ্য ভাঙার জন্যই তার এই ধ্বনিসঞ্চার। নৈঃশব্দ্য কি তাকে একাকিত্বের ভয় দেখায়? কথা কি তাকে একাকিত্ব থেকে উদ্ধার করে? আর কথা বলতে শেখার পর ওই শিশুকাল থেকে কথা দিয়েই তো সমস্ত কাজকর্ম, কথাময় এই মানবজীবন। খিদে পেলে মাকে জানানো, খিদে না পেলে 'খাব না' বলা (আমার ছোটো নাতি এখনও তা পারে না, তাই সে মুখ থেকে অবলীলাক্রমে খাবার ফেলে দেয়), খেলার মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাঁচামেচি, সখীদের কানে কানে গোপন কথা, অজস্র কথার জাল বুনে দিনরাত্রির রুটিন নির্মাণ করি আমরা–স্কুলের শিক্ষা, প্রিয় মানুষকে বেছে নিয়ে মনের কথা বলা, সাংসারিক খুনসুটি, পাড়ার বা বস্তির কলতলার ঝগড়া, অফিসে কারখানায় কাজকর্ম, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ধর্মীয় মন্ত্র, মসজিদের আযান, গির্জার প্রার্থনা, রাজনৈতিক বক্তৃতা, আইনসভায় তর্কবিতর্ক, কূটনৈতিক চুক্তি–সবই কথা দিয়ে সমাধা হবে। হয় মৌখিক, না-হয় লিখিত কথা। কোথাও হয়তো তার সঙ্গে একটু সুরও লাগাতে হয়। অর্থাৎ মানুষের ভাষা আপনাকে ব্যবহার করতেই হবে, যেহেতু আপনি মানুষ হয়ে জন্মেছেন।

এ কথাটা আলংকারিক উচ্ছ্বাস নয়– মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর তো ভাষাই নেই। তারা আপনার মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। গুছিয়ে মানে ধ্বনি জুড়ে শব্দ তৈরি করে, শব্দ জুড়ে পদবন্ধ (phrase), পদবন্ধ জুড়ে বাক্য, আর একটার পর একটা বাক্য জুড়ে নানা মাপের বক্তব্য তৈরি করে। কোনো পশুপাখির চৌদ্দপুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। পশুপাখিদের এই যে গালাগাল দিলাম, তাও তারা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ভাবুন তো প্রকৃতির কী একচোখোমি! কিন্তু প্রকৃতির এই অন্যায্য পক্ষপাত নিয়ে অন্য প্রাণীরা যে অভিযোগ করবে, তারও ভাষা তাদের দেওয়া হয়নি। এ ভারী এক অবিচার বটে।

কিন্তু এই অবিচার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের কথা বলার একটা জরুরি দিক নিয়েই একটু ভাববার চেষ্টা করি আমরা। কথা বলার সেই জরুরি অংশ হলো চুপ করে থাকা। অর্থাৎ আগে যেমন বলেছি, নৈঃশব্দ্য ভাঙবার জন্যই আমরা কথা বলি। নৈঃশব্দ্য না ভাঙলে মানুষে মানুষে যোগ হয় না। শুধু তাই নয়, মানুষে মানুষে বিয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ঘটাতে হলেও কথা বলতে হয়, অর্থাৎ ঝগড়া করতে হয়। ঝগড়া আর কিছুই নয়, এক বিশেষ ধরনের কথার ব্যবহার, নৈঃশব্দ্যকে এক বিশেষ কায়দায় অপমান করার চেষ্টা। কিন্তু আবার নৈঃশব্দ্যও কখনো কথাকে নিরস্ত করে, প্রগল্‌ভতাকে তিরস্কার করে। অনেক কথা বলার পর আমরা নৈঃশব্দ্য প্রার্থনা করি। হয়তো অনেক কথা শোনার পরেও। যা শুনলাম তা নিয়ে ভাববার জন্য নৈঃশব্দ্য, যা বললাম বা বলব তা নিয়ে ভাববার জন্য নৈঃশব্দ্য। পরে আমরা তা লক্ষ করব।

২ ব্যাকরণ ও নৈঃশব্দ্য

ভাষার ব্যাকরণে বলে, কথার অন্যতম উপায়, অর্থাৎ 'বাক্য'-এর সীমানা দুটি নৈঃশব্দ্যরেখা। এর মানে হলো, এক নৈঃশব্দ্য ভেঙে বাক্য আরম্ভ হয় এবং আর-এক নৈঃশব্দ্যে গিয়ে শেষ হয়, তার পর দ্বিতীয় বাক্যটি শুরু হয়। টানা কথার স্রোতে এই বাক্যের দুই নৈঃশব্দ্যের দেওয়াল আমাদের শ্রুতিতে ধরা না পড়লেও ব্যাকরণে তা আছে ধরে নেওয়া হয়। এমনকি, দুই পদবন্ধের (phrase)-এর মধ্যে নৈঃশব্দ্যের দেওয়াল, বা দুই শব্দের (word) মধ্যে সেই দেওয়াল। এগুলি টানা কথায় সব সময় ধরা পড়ে না। আবার বাক্যের চেয়ে বড়ো খণ্ড, ধরা যাক অনুচ্ছেদের আগে পরেও একটু বিরাম আছে। সেটা কখনও ধরা যায়, কখনও যায় না, মুখের ভাষায় অন্তত। কিন্তু সে দেওয়ালগুলি যে আছে তার প্রমাণ হলো প্রয়োজন হলে আমরা ওই উপাদানগুলিকে আলাদা আলাদা করে আনতে পারি, তাদের পুনরাবৃত্তি করতে পারি। অর্থাৎ তারা যে পৃথক অস্তিত্ব তা ভাষার ব্যাকরণে স্বীকৃত। ভাষার অর্থপূর্ণ খণ্ডের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্যই অনেক সময় ব্যাকরণ নৈঃশব্দ্যের ধারণাটিকে ব্যবহার করে।

তা ছাড়া, কথার প্রয়োগে আমরা আরও অনেক রকমে নৈঃশব্দ্যের ব্যবহার করি। ধরা যাক, একটা চমকপ্রদ, শ্রোতাদের কাছে অপ্রত্যাশিত, খবর ভাঙবেন কেউ। –'আপনারা কি জানেন যে এ কথাটা বলেছেন স্বয়ং–(বলে নাটকীয় বিরাম), এবং তার পরে হয়তো

বিস্ফোরণের মতো 'প্রধানমন্ত্রী !' কথাটা ছিটকে বেরোয়। নাটককার এবং অভিনেতারা এই নাটকীয় pause-এর চমৎকার ব্যবহার করেন, বস্তুতপক্ষে সুবক্তা এবং সু-অভিনেতাদের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে তাঁদের কথার সার্থক উচ্চারণের সঙ্গে নৈঃশব্দ্যকে কতটা নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তার উপর। এটি খানিকটা নৈঃশব্দ্যের নন্দনতত্ত্বের অংশ–নৈঃশব্দ্য শুধু কথাকে আকর্ষক করে তোলে না, নিজেও সেই আকর্ষণের উৎস হয়ে ওঠে।

অনিয়ন্ত্রিত, অনান্দনিক নৈঃশব্দ্যও আছে। যেখানে কথা খুঁজে পান না বক্তা–এ রকম বক্তার কথা শোনবার সুযোগ বা দুর্যোগ আমাদের অনেকেরই হয়েছে–তখন তাঁরা বেশ খানিকটা চুপ করে থাকেন। ভারতের একজন অতিবৃদ্ধ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের মনে হতো কথা বলার মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, তার পর জেগে উঠে আর-একটা শব্দ বলছেন। অনেকে এই অবাঞ্ছিত নৈঃশব্দ্যকে এড়ানোর জন্য 'মানে, মানে, ইয়ে–', 'ওর নাম কী,' 'ব্যাপারটা হলো' ইত্যাদি 'আমতা-আমতা' শব্দ ব্যবহার করেন, ইংরেজিতে যাকে বলে hesitation phenomena। এ থেকে বোঝা যায় মানুষের কথা বলার একটা স্বাভাবিক গতি আছে, তার চেয়ে লয় ধীরে বা দ্রুত হলেই তা আমাদের চোখে পড়ে যায়, তাকে একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। নানা মানুষের কথা বলার ভঙ্গিতে এই নৈঃশব্দ্যের অনুপাত ও ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হতেই পারে।

মুখের কথা থেকে একটু সরে এসে লিখিত বা মুদ্রিত সাহিত্যের এলাকায় ঢুকলে দেখি, কবিতায় নৈঃশব্দ্যের ভূমিকা প্রথমত অন্যরকম, দ্বিতীয়ত, গদ্যের তুলনায় হয়তো অনেক বেশি। সে নৈঃশব্দ্য পরিকল্পিত। 'নৈঃশব্দ্যের তর্জনী'র কথা বলেছেন শঙ্খ ঘোষ–তা তর্জনী না হোক, বাধ্যতা তো আছেই। কবিতার দু দিকে যে সাদা অংশ ছাড়া থাকে পাতার, তা তো এক ধরনের নৈঃশব্দ্যই। আর তার ছত্রের মধ্যেও আছে কথার সঙ্গে নৈঃশব্দ্যের বুনোট। আমাদের ছন্দের বইয়ে আমরা কবিতার ছন্দের সংজ্ঞা দিয়েছি যে, কবিতার ছন্দ হলো 'ধ্বনি ও নৈঃশব্দ্যের, উচ্চারণ ও বিরামের, সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাস' (সরকার, ২০০৪ : ১১)। লিখিত/ মুদ্রিত সাহিত্যে কমবেশি নৈঃশব্দ্য বোঝানোর জন্য অনেক সময় নানা যতিচিহ্নের ব্যবহার করা হয়। কবিতাতে কখনও কখনও একালের কবিরা তা সেভাবে ব্যবহার করেন না। যতিচিহ্নের ব্যবহার হোক না হোক, সেই কবিতা আবৃত্তির সময়ে তার মধ্যে অনুস্যূত নৈঃশব্দ্যকে সম্মান না দিলে সে কবিতার আবৃত্তি অর্থময় হয়ে ওঠে না।

আমাদের এ প্রবন্ধ কথা বলা নিয়ে ততটা নয়, যতটা চুপ করে থাকা নিয়ে। চুপ করে থাকা নিয়ে কথা বলা, এ কথাটা নিয়ে আপনাদের হাসি পেতে পারে–দ্যাখো, চুপ করে থাকা নিয়েও কথা বলার আছে!

আছে বই কি! এ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি (১৯২৮-) বলেছেন, কথা বলা বা মানুষের ভাষাব্যবহার হলো, ধ্বনির পরে ধ্বনি জুড়ে অর্থ প্রকাশ করা। আগেই এমন

কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন, শুধু কথা বলেই কি আমরা অর্থ প্রকাশ করি? চুপ করে থেকেও কি আমরা অর্থ প্রকাশ করি না? কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের কথা বলা আছে বলেই চুপ করে থাকা অর্থ পেয়ে যায়। চুপ করে থাকা মানে নিছক কথার অভাব নয়। কথা বললেই অর্থ তৈরি হবে, আর সেই অর্থ ধরে নিয়ে শ্রোতা আরও কথা বলবে, আরও অর্থ তৈরি করবে, অনন্ত কথার স্রোত বয়ে চলবে–ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। কোথাও কোথাও কথা থামাতে হবে আমাদের।

৩ নৈঃশব্দ্যেরও অর্থ আছে

যেমন বলা হলো, মানুষের কথার অর্থ আছে বলে নৈঃশব্দ্যেরও অর্থ তৈরি হয়ে যায়। তাই এই জরুরি কথাটা মনে রাখব, কথা না থাকলে নৈঃশব্দ্য অর্থময় হতো না। মানুষের মূকাভিনয় মূলত নিঃশব্দ অভিনয় হলেও ওই নিঃশব্দ অভিনয় তখনই অর্থময় হয়ে উঠে যখন আমরা কথা দিয়ে তার অর্থকে বুঝে নিই। বস্তুতপক্ষে ভাষার পটভূমিকা না থাকলে, মানুষ ভাষার সাহায্যে বিপুল অর্থের কারবারের অংশীদার না হলে, মূকাভিনয় এত অর্থময় হতো কি না সন্দেহ। পশুপাখির আওয়াজ আমরা কমই বুঝি (অবশ্যই তা বোঝবার চেষ্টা শুরু হয়েছে, উম্‌বের্তো একো 'পশু-চিহ্নতত্ত্ব' বা zoosemiotics বলে একটি শাস্ত্রের কথা বলেছেন) কিন্তু 'অবোলা জীব'দের ভাবভঙ্গি যে আমরা তেমন বুঝি না, তার কারণ আমরা এর ভাষার অংশীদার নই। হয়তো তাদের আচরণের মধ্যে নানা অর্থ ফুটে ওঠে। পশুদের মূকাভিনয় করার ক্ষমতা নেই, কারণ পশুদের ভাষা নেই। মূকাভিনয় তো একটা শিল্প, যা শুধু নৈঃশব্দ্যকে ব্যবহার করে না, মুখ-চোখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা অর্থময় আচরণ ও ভাবভঙ্গিকেও ব্যবহার করে। সে ভাবভঙ্গিগুলিও অর্থবহ। অর্থবহ, কারণ সেগুলি ভাষাব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও সেগুলিতে অর্থ তৈরি থাকে, যেমন বাঙালিরা মাথা দুপাশে নাড়িয়ে বা হাতের ইশারা করে 'না' বোঝাতে পারে, কপাল চাপড়ে হতাশা বা দুঃখ বোঝাতে পারে। এই সমস্ত অঙ্গভঙ্গির অনেকটাই সংস্কৃতিবদ্ধ। টেলিভিশনের ছবি 'মিউট' করে দিলেই আপনারা লক্ষ করবেন, মানুষ কত হাত মাথা শরীর নাড়াচ্ছে, চোখের মণির কত চলাফেরা হচ্ছে, ঠোঁটের কত ভঙ্গিমা, কাঁধ উঁচু করে, হাতের চেটো উলটে দিয়ে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কত ভঙ্গি। এই অঙ্গভাষা বা gesture language ভাষার সঙ্গেই সংগত করে। আমরা এমন বলি না যে, ভাষা ছাড়া তার কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। নিশ্চয়ই এই ইঙ্গিতগুলি ভাষারও আগেকার, তখন মানুষ এগুলি দিয়েই অনেক অর্থ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এও ঠিক যে, ভাষা থেকেই তাতে অনেকখানি অর্থ সঞ্চারিত হয়। তাই ভাষা বাদ দিলেও মূকাভিনয়ের অনেকটাই অর্থবহ হয়ে ওঠে। ভাষা অঙ্গভঙ্গিকে অর্থ দেয়, অঙ্গভঙ্গি মূকাভিনয়কে অর্থ দেয়।

ভাষার সাধারণ যে ব্যবহার, তার অনেকটাই সামাজিক–অর্থাৎ একাধিক, অন্তত দুজন মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানে ভাষা অপরিহার্য। নিচে আমরা নৈঃশব্দ্যের সামাজিক উৎসের কথা বলব, পরে ব্যক্তিগত উৎসের কথাও বলব। কিন্তু এই সতর্কবাণী যোগ করব যে, ব্যক্তিগত উৎসও এক ধরনের সামাজিক উৎস। মানুষ যেমন বহুলাংশে নিজের সঙ্গে

কথা বলে না, তেমনই তার নিজের নিঃশব্দ থাকার সিদ্ধান্তও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক, প্রতিবেশগত। তার নৈঃশব্দ্য গ্রহণের জন্য একটা সামাজিক বা প্রতিবেশগত চাপ তৈরি হয়। আমরা যে ভাগটা করব তা এই অনুসারে যে, নিঃশব্দ থাকার সিদ্ধান্ত কি অন্যদের চাপানো, না ব্যক্তিটির নিজের? আবার মনে রাখি যে, এই বিভাগ পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়।

ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে যেমন সীমাহীন অর্থের খেলা আছে, তেমনই নৈঃশব্দ্যের অর্থও বহুবিধ। সেই অর্থের অলিগলি আমরা সন্ধান করার চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে অন্যের চাপিয়ে দেওয়া নৈঃশব্দ্য আর স্বনির্বাচিত নৈঃশব্দ্যের সূত্রগুলি লক্ষ করি–কিন্তু আবার বলি, স্বনির্বাচিত নৈঃশব্দ্যের পিছনেও সমাজের বা বাইরের পৃথিবীর ভূমিকা অলক্ষ্য নয়।

৪ অন্যের চাপানো নৈঃশব্দ্য : আধিপত্যের রকমফের

ঘটনা এমন নয় যে, মানুষ সবসময় কথা বলবে। অতি শৈশবে সে কথা বলতে শেখে না, কিন্তু কান্না দিয়ে তার নৈঃশব্দ্যকে প্রতিহত করে। জন্মের পর না কাঁদলেই আবার ডাক্তারের দুশ্চিন্তা হয়, তখন সে পেছনে থাবড়া মেরে শিশুর নৈঃশব্দ্যকে কান্না দিয়ে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। আবার জীবনের শেষ লগ্নে সে নীরব হয়ে যায়, রামমোহন রায়ের গানে যেমন আছে, 'মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর, অন্যে যা কয় কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।' সেই জৈবিক নৈঃশব্দ্য আসে ঘুমের মধ্যেও (অনেকে স্বপ্নে কথা বলে, বক্তৃতা দেয়–এমন শুনেছি বটে)। কোনো গভীর অনুভবও মানুষের মধ্যে নৈঃশব্দ্যের সঞ্চার করতে পারে–শোক, প্রেম, বিস্ময় ইত্যাদি। আত্মনিমগ্নতা নৈঃশব্দ্যকেই আমন্ত্রণ করে। আবার অনেক মানুষ স্বভাবতই বাচাল, অনেক মানুষ স্বভাবতই স্বল্পবাক। রবীন্দ্রনাথ 'হিং টিং ছট্' কবিতায় মেয়েদের বহুকথন সম্বন্ধে লোকায়ত ধরনে অত্যুক্তি করেছেন–'মেয়েরা করেছে চুপ এতই বিভ্রাট'–আজকের দিন হলে হয়তো তিনি এমনটা বলতে সাহস করতেন না। ছেলেবেলায় ফরাসি নাট্যকার আনাতোল ফ্রাঁস-এর একটি একাঙ্ক পড়েছিলাম, যাতে মূক স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়ে স্বামী বেচারা খুব বিপদে পড়েছিল। সে হঠাৎ অনর্গল এত কথা বলতে শুরু করে যে, স্বামী ভদ্রলোক তাকে থামাবার আর কোনো দিশা পায় না। শেষে সে নিজে বধির হওয়ার জন্য ডাক্তারের সাহায্য চায়। কিন্তু বাচালতা শুধু মেয়েদের একচেটিয়া নয়। কবি তারাপদ রায়ই তো লিখে গেছেন, 'আমাকে বাচাল যদি করেছ মাধব (হে পরমানন্ধ মাধব), বন্ধুদের করে দিও কালা।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করার সময় মানুষ চুপ করে থাকবে, নিঃশব্দে বই পড়বে (অন্তত প্রাপ্তবয়স্করা–ছোটোরা হাসির গল্প পড়তে পড়তে হাসতে পারে) আচ্ছন্ন হয়ে কোনো অভিকরণ (performance) দেখা বা শোনার সময়–গান, নাচ, নাটক, চলচ্চিত্র বা যার মাধ্যম মিউজিক সিস্টেম, ভিডিও, দূরদর্শন ইত্যাদি শ্রোতা বা দর্শক হয়ে সে স্তব্ধ থাকবে–সেটা একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গ, শ্রোতা বা দর্শকের ভূমিকা মূলত নিঃশব্দ থাকার। ওগুলি অন্যদের আধিপত্যের ফলে জাত নৈঃশব্দ্য নয়, যেন এক ভদ্রলোকের চুক্তি। অবশ্যই কোনো কোনো উপভোক্তা আবেগের বশে এই চুক্তিসম্মত

নৈঃশব্দ্য ভাঙেন, 'আহ্! উহ্! দারুণ! কেয়াবাত! কেয়া খুব! চমৎকার! ব্রাভো! আবার হোক! ইত্যাদি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ছেলেবেলায় হিন্দি চলচ্চিত্র দেখতে গিয়ে সস্তাদামের সিটে বসা তরুণ দর্শকদের কোনো রোমান্টিক দৃশ্যে সজোরে সিটি বাজাতে দেখেছি, শেয়ালের ডাকও উঠেছে। তা সামাজিক চুক্তি বা শর্তকে লঙ্ঘন করেই। বিনোদন উপভোগ করবার জন্য যে নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ সমাজ আমার জন্য তৈরি করেছে, তুমি কেন তাকে ভাঙবে? অন্যরা তা সহ্য করেছে, কিন্তু মনে মনে অনুমোদন করেনি।

সমাজের নানাস্তরে সাজানো আধিপত্য বা ক্ষমতার তারতম্যের কথাটা তুললাম কেন? তুললাম এই কারণে যে, দুজনে সমানে-সমানে কথা বলছি, এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সবসময় আমাদের সমাজ আর প্রতিবেশ তৈরি করে রাখে না। সংলাপ বা conversation হয় অধিকাংশ সময় সমানে সমানে। অবশ্যই উপরে-থাকা নিচে-থাকা লোকেরও সংলাপ চলতে পারে, কিন্তু সে সংলাপের চরিত্র একটু আলাদা হয়। সমানে-সমানে সংলাপের দৃষ্টান্ত বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক, আড্ডা, এমনকি ঝগড়াঝাঁটি। উপরে-নিচে সংলাপ মালিক-কর্মচারীর, অফিসের বস্ আর অধস্তনদের, গুরু-শিষ্যের, শিক্ষক-ছাত্রের। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংলাপে সকলে সমান ভাগ নেয় না, শেষের জন কম কথা বলে, অনেক সময় আদৌ বলে না। পারিবারিক আধিপত্য-বিন্যাসে এক সময় উপরে থাকা স্বামী স্ত্রীকে অনায়াসেই বলতে পারত, 'চুপ্ করো, যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না'। এখন সে বিন্যাস কতটা বদলেছে তা আপনারাই বেশি জানেন। শহরে শিক্ষিত পরিবারে যতটা বদলেছে, গ্রামে বা রোজগেরে স্বামী এবং নিরোজগেরে স্ত্রীর পরিবারে হয়তো ততটা বদলায়নি। নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে, গুরুজন-লঘুজনের সম্পর্কটাও প্রায় একই রকম। 'গুরুজনদের কথা চুপ করে শুনবে', 'গুরুজনদের মুখে মুখে তর্ক করবে না'–ইত্যাদি অনুশাসনও এই রকম একপক্ষের উপর খানিকটা নৈঃশব্দ্য চাপিয়ে দেয়। কোনো কর্পোরেট মালিক হয়তো নিজের টেবিলের উপর একটা ট্যাবলেটে লিখে রাখেন 'আমি যখন কথা বলছি তখন দয়া করে কথা বলবেন না'। এটা নৈঃশব্দ্য চাপানোর বিজ্ঞপ্তি নাও হতে পারে, হয়তো এটা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি তিনি অবিঘ্নিতভাবে বলে যেতে চান এবং সেজন্য শ্রোতাদের বশংবদ মনোযোগ প্রার্থনা করেন। তেমনই নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে ব্যক্তির আধিপত্যের চেয়ে বিষয়ের গুরুত্ব হয়তো বেশি হয়ে ওঠে, তখন বিষয়ের প্রতিই অনুগামীদের নৈঃশব্দ্য উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, আধিপত্য-সোপানের উপরে নিচে থাকা লোকেদের মধ্যে উপরের লোকেদের কথা বলবার অধিকার বেশি, নিচের লোকেদের কথা না-বলবার বা কম বলবার 'অধিকার' বেশি। অর্থাৎ তাদের উপর চাপানো নৈঃশব্দ্যের ভাগ বেশি। বাংলায় 'ছোটো মুখে বড়ো কথা' আধিপত্য-সোপানে নিচের ধাপের লোকদের কথা বলাতে একটি নিষেধাত্মক বাগ্‌ধারা।

অবশ্যই আমাদের সমাজ বা প্রতিবেশ প্রায়ই একমুখী বয়ানের ব্যবস্থা করে রাখে, সেখানে সংলাপের কোনো সুযোগ নেই। রাজনৈতিক বা শ্রমিক নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন,

শিক্ষক ক্লাসে পড়াবেন, সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ হবে, ধর্মগুরু উপদেশ দেবেন, তখন একপক্ষ নিঃশব্দে শুনবে–এটাই প্রার্থিত। কোথাও কোথাও প্রশ্ন করার অবকাশ আছে, বক্তৃতার পরে বা মাঝখানে হাত তুলে, কিন্তু সব জায়গায় সমানভাবে তা স্বীকৃত হয়নি। স্কুল-কলেজের ক্লাসে ছাত্ররা প্রশ্ন করলে কোনো কোনো শিক্ষক এক সময় বলতেন, 'বেশি ফাজিল হয়েছিস, বা খুব বেশি পেকে গেছিস মনে হচ্ছে।' এখন সে কথা বলতে সাহস পান কি না জানি না। এই নৈঃশব্দ্য ঠিক শাস্তি নয়, তা যেন অনেকটা আগের ওই ভদ্রলোকের চুক্তির মতো। এতে আধিপত্যের চিহ্ন আছে, কিন্তু আবার খেলার নিয়মেরও একটা চরিত্র আছে। এই সব জায়গায় একজনই সাধারণত বলবে, অন্যেরা চুপ করে থাকবে, কথা বলার সুযোগ থাকলে তাও শর্তসাপেক্ষ।

আধিপত্যের চাপানো নৈঃশব্দ্য অনেক সময় শাস্তিরও চেহারা নেয় না, তা নয়। ক্লাসে ছেলেমেয়েরা গোলমাল করলে আমাদের সময় পর্যন্ত মাস্টারমশাইরা নানা রকম শাস্তি দিতেন–বেত্রাঘাত থেকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা পর্যন্ত। পশ্চিম ভূখণ্ডে বাড়িতে বাচ্চা দুষ্টুমি করলে অভিভাবকেরা তাকে ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসিয়ে ওই কোণের দিকে মুখ করে চুপচাপ থাকতে বলেন কিছুক্ষণ, খবরের কাগজে 'ডেনিস দ্য মিনাস' নামক বালকের কার্টুনে যা প্রায়ই দেখা যায়। আমার বড়ো নাতি গণেশ সব সময় প্রচুর কথা বলত বলে দেখেছি, গাড়িতে যেতে যেতে তার মা, আমার বড়ো মেয়ে, তাকে বলত, 'আচ্ছা আমরা এই বাঘা যতীন থেকে গাঙ্গুলিবাগান পর্যন্ত (মিনিট চারেকের রাস্তা) চুপ করে থাকব, কেমন?' এখানে শাস্তি কিছুটা খেলার চেহারা নেয় বলে ততটা দুঃসহ হয়ে ওঠে না, কিন্তু এই চাপানো নৈঃশব্দ্যেও আধিপত্যের দাগ আছে, তাও এক ধরনের শাস্তিই। এতে একপক্ষ সামাজিক-পারিবারিক হিসেবে বেশি শক্তিশালী, অন্যপক্ষ তুলনায় দুর্বল। শক্তিমানের শাস্তি দেওয়ার অধিকার সমাজ স্বীকার করে।

আধিপত্যের হুমকিতে নৈঃশব্দ্য চাপিয়ে দেওয়া এবং তার ক্ষতিকর পরিণামের দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছিল উনিশ-শো ষাটের বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যখন কালো ছেলেমেয়েদের সাদা মাস্টারদের স্কুলে সাদা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

এমনিতে কালো ছেলেমেয়েরা তাদের বাড়িতে বা পাড়ায় খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে প্রচুর কথা বলে। সেটা সকলেই লক্ষ করেন। কিন্তু তাদের সেই ইংরেজি কথা সাদা আমেরিকানদের ইংরেজি নয়, তা একটি অ-প্রমিত ('নন্-স্ট্যান্ডার্ড') উপভাষা, তার নাম 'ব্ল্যাক ইংলিশ ভার্নাকিউলার' বা 'বিইভি'। সাদা মাস্টারমশাই বা দিদিমণিরা যখন ক্লাসে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন, তখন তারা তাদের ওই ঘরের ভাষায় ('হোম ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ) উত্তর দিলেই সাদা শিক্ষকেরা ধমকে উঠতেন, বলতেন, 'এই, 'শুদ্ধ' ইংরেজি যদি বলতে না পারিস তবে স্কুলে এসেছিস কেন?' এমন কথা আমাদের ঘরের আশেপাশের স্কুলগুলিতেও যে শোনা যায় না, তা নয়। এখানেও মাস্টারমশাইরা/ দিদিমণিরা বলেন, 'এই ছেলে বা মেয়ে, শুদ্ধ

বাংলা বল্!' অন্য ভাষার ছেলেমেয়ে যদি বাংলা স্কুলে পড়তে আসে, ক্লাসঘরের বাইরে যদি তারা নিজেদের ভাষায় বা শিক্ষকের কাছে দুর্বোধ্য ঘরের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে, শিক্ষক হয়তো বলেন, 'কী রে, তোরা আমাকে গালাগাল কচ্ছিস না তো?' বাস্, তাদের উপর ভয় ও নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।

আমেরিকার স্কুলগুলিতে এর ফল হয়েছিল এই যে, ক্লাসে প্রশ্ন করলে কালো ছেলেমেয়েরা আর মুখ খুলতে চাইত না, তারা ভয়ে চুপ করে থাকত। তাই সাদা শিক্ষকেরা বলতেন, ওই কালো ছেলেমেয়েগুলি নির্বোধ, ওরা ক্লাসে কোনো বিষয়ে মুখই খুলতে চায় না। এতেই প্রমাণ হয় ওরা কিছুই শিখছে না, লেখাপড়াতেও পিছিয়ে যাচ্ছে।' এই জন্য তখনকার প্রেসিডেন্ট জন্সন কালো ছেলেমেয়েদের সাদা ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। তাতে উইলিয়াম লেবভের মতো সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা আপত্তি করে বলেছিলেন যে, ক্লাসে ওদের নিজেদের ভাষায় কথা বলবার সুযোগ দিলেই ওরা কতটা শিখছে তা বোঝা যাবে। ওদের বলতে হবে যে, তোমার ঘরের ভাষাটাও একটা ভাষা–তাতে তুমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পার। কিন্তু স্কুলে আর এক ধরনের ইংরেজি তোমাকে শিখতে হবে, লিখতে হবে–সেটাতে তোমাকে আমরা সাহায্য করব। নিজের ভাষা নিয়ে তোমার লজ্জা-সঙ্কোচের কিছু নেই।

অনেক সময়ে শক্তিশালী ভাষা যে দুর্বল ভাষাকে মেরে ফেলে, তাও এক মারাত্মক নৈঃশব্দ্যের আরোপ। পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিতেই এমন ঘটেছে।

'চুপ!' বা হিন্দিতে 'চোপ্!' কথাটি অনেক সময় এক প্রবল ও বজ্রকণ্ঠ ধমক হিসেবে দেখা দেয়–আমাদের কাছে ইংরেজি shut up!–এর জোর হয়তো আরও বেশি। এখানেও একটা আধিপত্যের জোর, সেটা এক মুহূর্তের জন্য হলেও ফুটে ওঠে। ঝগড়ার সময়ে মনের মধ্যে উন্মথিত হওয়া ক্রোধ আমাদের মধ্যে একটা কৃত্রিম আধিপত্যবোধ জোর গড়ে তোলে, তারই উচ্চারণ ওই শব্দগুলি।

আধিপত্যের এই স্পষ্ট এলাকাগুলি ছাড়াও, খানিকটা সমস্তরের মানুষদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বা বার্তালাপের সময় সাধারণত একটা নৈঃশব্দ্যের চুক্তি দরকার হয়। তাকে ইংরেজিতে বলে taking turns। অর্থাৎ অন্যে যখন কথা বলবে, তখন তুমি তা চুপ করে শুনবে। আমরা প্রায়ই অবশ্য সে চুক্তি ভাঙি, একজন কথা শেষ না করলেও তার মধ্যে নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দিই। বন্ধুদের মধ্যে এ ব্যাপারটা বেশি হয়, সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, মেয়েরাও এই ব্যাপারটা বেশি করে করে। এটাকে শর্ত ভঙ্গ হিসেবে না দেখে অনেকে বলেন, যারা এ রকম করে তারা আলাপে উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করতে চায় বলেই ও রকম করে, তারা মনে করে এই আলোচনায় তারাও নিজের কিছু যোগ করতে পারে। তবু taking turns, বা নিজের পালা এলে কথা বলা, বাকি সময়টুকু চুপ করে অন্যের কথা শোনা সামাজিক শিষ্টাচারের অঙ্গ। সাধারণ আলোচনায় বা কলকাতার টেলিভিশনের বিতর্কে প্রায়ই এটা ঘটে না, সে জন্যে 'আমার কথাটা শেষ করতে দিন,

আমি আপনার কথা সবটাই চুপচাপ শুনেছি'–এ রকম সংলাপ আমাদের আমোদিত করে।

৫ নৈঃশব্দ্য : নিজের নির্বাচন

আরোপিত আর স্বনির্বাচিত–নৈঃশব্দ্যের এই ভাগ যে কৃত্রিম তা আগেই বলেছি, কারণ একেবারে শারীরিক বা জৈবিক ছাড়া সব নৈঃশব্দ্যের উৎসই সামাজিক আদান-প্রদান থেকে, কথার মতোই তা মূলত interactive। শঙ্খ ঘোষের 'ভিখিরি ছেলের অভিমান' (ঘোষ, ১৩৯৭ : ২২৮) কবিতার ওই ছেলেটির কথাই ধরুন। সে যখন 'গাইব না গান' বলে নৈঃশব্দ্যের দ্রোহবার্তা দেয় তখন তা একই সঙ্গে স্বনির্বাচিত, আবার বাবুদের ব্যবহার-প্রতিবেশের দ্বারা প্রণোদিত। কাজেই আরোপিত ও স্বনির্বাচিত–এই ভাগ শুধু কাজের সুবিধের জন্য। আগেই বলেছি, ভাষা যেমন দ্বিমুখী–অর্থাৎ তার একজন বক্তা আর একজন শ্রোতা দরকার, তেমনই নৈঃশব্দ্যও দ্বিমুখী–তারও একটা লক্ষ্য থাকে। অর্থাৎ নৈঃশব্দ্যও শুধু নিজের জন্যে নয়, অন্যকেও তা কিছু বলতে চায়। অনেক জৈন সন্ন্যাসী মুখে কাপড় বেঁধে মৌনব্রত পালন করেন, শুনেছি নৈঃশব্দ্যযাপন ছাড়াও তার আর-একটা কারণ আছে। মুখ খোলা থাকলে তাঁর মুখে অদৃশ্য পোকামাকড় ঢুকে গিয়ে মারা পড়বে, সেই পাপ তিনি ঘটতে দিতে চান না। মহাত্মা গান্ধি আবার সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকতেন নেহাতই সংযমচর্চা হিসেবে, বহু কথা বলার মধ্যে একটা আতিশয্য আছে, অসংযম আছে, একদিন মৌনী থেকে কেউ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চান, বাগ্‌ব্যবহারে সামঞ্জস্য আনতে চান। এই আনুষ্ঠানিক নৈঃশব্দ্য বা 'রিচুয়ালিস্টিক সাইলেন্স' সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই, কারণ এক হিসাবে তা ধর্মপালনের অঙ্গ। ধ্যান বা meditation এই এক ধরনের আচারিক নৈঃশব্দ্যকে গ্রহণ করে। কবি যে বলেন, 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে'– তা ওই নিজের সঙ্গে আরও গভীর সংলাপে মগ্ন হওয়ার ইচ্ছে থেকে। কিংবা যখন শঙ্খ ঘোষের কোনো সম্ভাবিকল্প (১৩৯৭ : ১৯৫) নিজেকে ঘরে ফিরে এসে তিরস্কার করেন–

> ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?
> চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?
> মনে হয় ফিরে এসে স্নান ক'রে চুপ ক'রে নীলকুঠুরিতে
> বসে থাকি?

ঠাকুরঘরে বসে জপতপ বা অন্যান্য উপাসনা হয়তো নৈঃশব্দ্য হিসেবে পুরোপুরি নাও চিহ্নিত হতে পারে, কারণ নিজের মনে মৃদুস্বরে মন্ত্র বা প্রার্থনা হতো তো তাতে চলত।

আর-এক ধরনের নৈঃশব্দ্য আসে ভয় থেকে–কথা বললে নিজের বা অন্যের বিপদ হবে। আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অনেক সময় সাক্ষী সরকারি উকিলের জেরার উত্তরে 'হ্যাঁ' বলতে চায় না, বা কোনো উত্তর দেয় না, এই অজুহাতে যে, because that will incriminate সব–উত্তর দিলে আমি অপরাধী সাব্যস্ত হব। মার্কিনদেশের যে কালো ছেলেমেয়েদের

কথা আগে বলেছি, তাদের নীরবতা ছিল অনেকটা এই জাতের। কেউ বোকার মতো কথা বলে ফেলে চুপ হয়ে যায়, হয়তো অন্যেরাও হুল্লোড় করে উঠে তাকে বলে, 'উহ্, তুই আর হাসাস না মাইরি, একটু চুপ করবি তুই!' বোকা বনে চুপ করে যাওয়ার কপাল আমাদের অনেকেরই হয়।

এই সূত্রেই হয়তো মনে পড়ে যাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত ইংরেজ কবি জন ডানের সেই বিখ্যাত দুটি লাইন, For heaven's sake, hold your tongue, and let me love.– 'দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর্, ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।' দুই প্রণয়ীর সান্দ্র সান্নিধ্যে এক ধরনের নীরবতা ডেকে আনে–'দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি, আকাশে জল ঝরে অনিবার।' সেই নীরবতার সাক্ষী কেবল কবিরাই হতে পারেন। কিন্তু প্রণয়ের উলটো যে ঘটনা, কলহ ও অভিমান–তাতেও তো মানুষ কথা বন্ধ করে দেয়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা সেই কথা বন্ধ করাকে একটা আনুষ্ঠানিকতা বা রিচুয়ালের চেহারা দেয়–'আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি, পরশু যাব ঘর' ইত্যাদি 'মন্ত্র' বলে। তার সঙ্গে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের সঙ্গে আর-একজনের ওই কড়ে আঙুল বাঁধিয়েও বিষয়টাকে পাকাপাকি করে নেয়। বৈষ্ণব পদাবলির 'মান' পর্যায়টিতে একপক্ষের নৈঃশব্দ্যের ব্যবস্থা ছিল তো বটেই।

শারীরিক ও মানসিক অভিঘাতে কথা বন্ধ হওয়ার ঘটনা প্রায় নিত্যদিনের। অসুস্থ হলে

কেউ কেউ নিঃশব্দ হয়ে যায়, আবার ব্যতিক্রম হিসেবে কেউ কেউ প্রগল্‌ভ হয়ে পড়ে। নেশাগ্রস্ততার ক্ষেত্রেও এই দুরকম ব্যবহারই দেখা যায়। অবশ্যই প্রবল শোকের আঘাতে কেউ মূক হয়ে যেতে পারে। সন্তানকে হারিয়ে বাবা বা মার নির্বাক হয়ে যাওয়ার ঘটনা সাহিত্যে অনেক চিত্রিত হয়েছে। তখন অন্যেরা চেষ্টা করে তাদের কাঁদানোর, না কাঁদলে তার প্রবল শরীরিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তাই বলে উত্তর ভারতে যা হয়, গতপ্রাণ প্রিয়জনের শোকে নিজেরা কাঁদি আর নাই কাঁদি, টাকা দিয়ে 'রুদালি' ভাড়া করে এনে গ্রামে শোকের মহোৎসব লাগিয়ে দেব–তাও স্বনির্বাচিত নৈঃশব্দ্যের খুব উজ্জ্বল উদাহরণ নয়। কথা বলে যে আমরা নৈঃশব্দ্য ভাঙি, তারও নানা রকমফের আছে। আগে দ্রুততা আর ধীরতার কথা বলেছি। তা ছাড়াও আছে, কথার ধ্বনির উচ্চতা-নিচতা। কেউ হয়তো খুব মৃদুস্বরে কথা বলেন, যা প্রায় নৈঃশব্দ্যের কাছাকাছি থাকে, আবার কেউ হয়তো গাঁক গাঁক করে এমন চেঁচিয়ে কথা বলেন যে দু-মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। দাপট নিয়ে কথা বলেন কেউ, কেউ বিনীত দাসানুদাসের মতো কথা বলেন। কত ভঙ্গি আছে কথা বলার, নৈঃশব্দ্যকে নিয়ে খেলা করার।

অথচ কথা মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার এক প্রতীক। কথাই মানুষকে তার অস্তিত্বের মূল অধিকার। মানুষ কথা বলবেই। কোন্ কথা? কীভাবে মানুষ তার নৈঃশব্দ্য ভাঙবে? চম্‌স্কি তাঁর 'দ্য রেস্পন্‌সিবিলিটি অব দি ইন্‌টেলেকচুয়াল' প্রবন্ধে যেমন বলেন, বুদ্ধিজীবীর দায় হলো, 'টু স্পিক দ্য ট্রুথ'। সত্য উচ্চারণ করা। কাজেই কথা বলবার সময় মিথ্যা থেকে

সত্যের শব্দ যেমন নির্বাচন করবেন তেমনই নৈঃশব্দ্যও নির্বাচন করবেন। কথার গতি নির্বাচন করবেন, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা-উচ্চতা-মৃদুতা নির্বাচন করবেন, ভঙ্গি নির্বাচন করবেন। উপলক্ষ, সময় ও সুযোগ নির্বাচন করবেন। এই রকম কত নির্বাচন আছে। এমনকি নৈঃশব্দ্যও আপনার নির্বাচনের অপেক্ষা করে। তবু কথা বলবেন, নিজের হয়ে অন্যের হয়ে সত্য কথা, হক কথা। এটা যদি উপদেশের মতো শোনায়, এ উপদেশ আমার নিজেরও জন্য।

এই জন্যই এত কথা বলা। কথা বলে কি কথা আর নৈঃশব্দ্যের সব কথা বোঝানো যায়?

সূত্রপঞ্জি

ঘোষ, শঙ্খ, ২০০১, *নৈঃশব্দ্যের তর্জনী*, কলকাতা, প্যাপিরাস

---, ১৩৯৭, *কবিতা সংগ্রহ ১*, কলকাতা, দে'জ

সরকার, পবিত্র, ২০০৪, *ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ*, কলকাতা, চিরায়ত

আমাদের ভাষায় প্রভাবক এবং প্রত্যাশা

মহাম্মদ দানীউল হক*

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে, লেখকের নিজস্ব কোনো তত্ত্ব নয় বরং তাঁর স্বীয় পর্যবেক্ষণে যেমনটি ধরা পড়েছে সেই বিদ্যমান ভাষা পরিস্থিতি ও ভাষার উন্নয়নে আপতিত প্রভাবকসমূহের মিশ্রণ-ফল। দৃশ্যত বাংলাদেশ একভাষী দেশ, কিন্তু সম্পর্কিত ইস্যুগুলো সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায়ে যে ক্রিয়াশীল এবং সেগুলোকে যে বিবেচনা না করে প্রকৃত ভাষা পরিস্থিতি তথা সমস্যার মর্মমূলে যাওয়া যায় না– বর্তমান নিবন্ধে এ সত্যের প্রতি নির্দেশ করার আভাষ, কিঞ্চিৎ সুচিন্তন হতে পারে।

প্রাক-কথন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে একটা প্রবণতা বা ধারা প্রচলিত হয়: ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশি ও স্বভাষী-স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি পর্যবসিত হয় এক সঞ্জীবনী (অতীব গুরুত্বপূর্ণ) ইস্যু হিসেবে যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন। আবার দেশীয় ভাষার প্রতিষ্ঠাপর্ব বাহ্যিক দৃষ্টিতে সফল মনে হলেও কালানুক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষার প্রভাব প্রায়-অপ্রতিরোধ্যই থেকে যায়। ফলত, ভাষা-সংঘাত (প্রকটরূপে দৃশ্যমান না হলেও) যুগ-যুগ পেরিয়েও বর্ণচোরের মতই রঙ বদলের পরতেই থেকে যায়। ইংরেজি-প্রধান ও ফরাসি-প্রধান আফ্রিকার (Anglo-phone and Franco-phone Africa) দেশে যে তা ব্যাপক হয়েছে তার সমাধান বুঝি এখনো অপেক্ষমাণ।

ঘটনাক্রমে দেখি যে, দক্ষিণ এশিয়ার ভাষা-সমস্যা নিয়ে UNESCO-র সর্বপ্রথম যে সম্মেলন শ্রীলংকায় ১৯৫৩ সনে অনুষ্ঠিত হয় তার মূল বিষয়টাই ছিল In search of a single medium of communication for living in the same world; এযুগে যদিও single medium of communication Ges same world কতটুকু বাস্তবসম্মত তা পুনর্বিচার্য; কিন্তু পরিহাস এই ছিল যে, সেই বছরই UNESCO একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল 'শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের তাগিদ' দিয়ে।

*অধ্যাপক (অব.), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কালান্তরের দীর্ঘ পরিক্রমায় এখন যেহেতু সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকভাবেই স্বল্প ক'টি ভাষা সম্পূর্ণ ব্যাপ্তিটির "আধিপত্য" গ্রহণ করেছে (শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার সুবিশাল ক্ষেত্রের কথা বাদ দিলেও) "Language hegemony" (ভাষা কর্তৃত্ব) নামধেয় এক পারিভাষিক প্রকাশ তাই বিশেষ আলোচ্য হয়ে উঠেছে। এ শুধু আমাদের স্মরণ করায় যে, এক ভাষার উপর অন্য ভাষার অধিক্রমণ (overlapping) এবং অপরাপর ভাষার কর্তৃত্ব এখনও এমন সমস্যা যার সমাধান অপেক্ষা করে আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তত্ত্বীয় সুপারিশ অদ্যাবধি কতটুকু পেরেছে বাস্তব ক্ষেত্রে ও মাঠপর্যায়ে ভাষা পরিকল্পনা মডিউল বাস্তবায়ন করে এই সমস্যার সমাধান করতে?

উনিশ শতকের শেষদিকে তো গবেষকগণ ওকালতি করছিলেন যে, সমাজ এবং রাষ্ট্রের খাতিরে সুচিন্তিত প্রচেষ্টায় ভাষাকে পরিবর্তিত করা যায়। সেই মতো ভাষা-সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য কতিপয় সুচিন্তিত প্রচেষ্টা বিবেচনায় আসে (নাথ ১৯৮৯ : ১২৫)। প্রধানত দ্বিবিধ কারণে তখন ভাষা পরিকল্পনার তোড়জোড় হয়েছিল, যার প্রধানটি ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্য-মুক্ত দেশের ভাষা সমস্যার সমাধান। দ্বিতীয়ত সেসব দেশের ভাষা সমস্যাকেন্দ্রিক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে, ভাষার ধারা সচেতনভাবে পরিবর্তনের একটা জোরালো সমর্থন সত্ত্বেও পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষাকে আমলে না নিয়ে উপায় নাই। একই সঙ্গে উদ্ভূত হয় নবতর ভাষা পরিস্থিতির বহুধা পরতের আরো সমস্যার সন্ধিক্ষণ। ৬০-এর দশকের বেশ ক'টি বিশ্ব সম্মেলনের পর American Society for Sociological Research Council (ASSRC) প্রকাশিত Language Problems of Developing Countries সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরে যে, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষাই মূলত উপনিবেশ-মুক্ত দেশগুলোতে প্রধান উপাদান (factor)।

ভাষা কর্তৃত্ব : অন্যতম হেতু

জনগোষ্ঠীর কথা বলা এবং দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহার পরিস্থিতির উপর বিজাতীয় সংস্কৃতি অথবা ভাষা কর্তৃত্ব বিষয়ক বিস্রস্ত প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে, হতে পারে তৎপরবর্তী করণীয় হিসেবে সেসব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অবান্তর পরিধিতে তার অর্থ খোঁজা; কিন্তু বর্তমান আলোচনায় প্রেক্ষাপট ও সময় স্বল্পতার বিবেচনায় তা পরিহার করা যায়।

বাস্তবতা এই যে, কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে-সঙ্গে তার ভাষা-আধিপত্য বিস্তার ও বৃদ্ধি পায়। এদেশে ব্রিটিশ ক্ষমতা লাভের পর যদিও ৩৫ বছর মোগল ও নবাবদের প্রশাসনিক ভাষা ফার্সির উপরই তারা নির্ভর করেছে, কিন্তু ব্রিটিশ-রাজ জাঁকিয়ে বসার পর তাদের ভাষা ইংরেজিকে প্রশাসনের ও সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠায় ফরমান জারি করতে কসুর করেনি (১৭৯২?)। ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো- কোনো ভাষা একটা সময়ে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করছে, আবার অধিকৃত অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষার উপরও রাজশক্তি বিভিন্ন মাত্রার

প্রভাব বিস্তার লাভ করছে। আর শতাব্দী পরম্পরায় বিশ্বজুড়ে ইংরেজি ও ফরাসি যে ব্যাপক শক্তিমান হয়েছে সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে, বর্তমান বিশ্ববাণিজ্য, রাজনীতি, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং সর্বশেষ তথ্য-প্রযুক্তির ডিজিটাল জগতে নিঃসন্দেহে এখন ইংরেজি প্রাধান্যের যুগ। যেহেতু ভাষা কর্তৃত্ব তথ্য-ভাণ্ডার ও তথ্য-প্রবাহ দ্বারা সংস্কৃতিকেও অর্থবহ করে তোলে, তাই ভাষা কর্তৃত্বকে, এমনকি, তুলনা করা চলে চিন্তা-চেতনার নিয়ন্ত্রক হিসেবে।

বাংলাদেশের দৃশ্যপট

জাতীয় ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, তত্ত্বীয় বিচারে ছিল সহজ-সরল। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা যেখানে বাংলা, যে ভাষার রয়েছে ঋদ্ধ ভাষিক বৈভব ও পারঙ্গমতা, সেক্ষেত্রে আপাত একভাষী জাতির ভাষা কোনো সমস্যা হতে পারে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে শতাব্দী পেরিয়েও বাংলা এর যথাযথ ব্যবহার-মর্যাদা প্রাপ্ত হয়নি। ভাষা পরিকল্পনার নিরিখে প্রতিবেশী বহুভাষী ভারত বা শ্রীলংকায় যেখানে এটি বড় সমস্যা বাংলাদেশে তা হতে পারত এক সন্তোষী অভিখ্যা। কিন্তু এর জন্য যেটির প্রয়োজন সেই 'ভাষা পরিকল্পনা' ইস্যুটি কখনো গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়নি। বাংলাদেশ-পূর্বকালে কিছু বাক্যোচ্চার এবং বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ ছিল, কিন্তু সেগুলো কোনো জোরালো ও দৃশ্যমান প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিন দশক পরে পুনরায় ভাষা পরিকল্পনা সম্ভূত কার্যপন্থা ও প্রয়োগ আলোচনায় উঠে, এবং সামনে চলে আসে; প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে যে, চমৎকার একভাষী পরিস্থিতিতে এই দেশ ও সমাজে কেন ভাষাগত আত্মনির্ভরতা সম্ভব হচ্ছে না?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভাষা পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়েছে– অতএব যথার্থ ভাষা পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন তো সময়ের বাস্তবতা এবং অবধারিত ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা হিসেবে। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতার মোহমায়া আর উচ্ছ্বাসের মধ্যেই বাংলাদেশ কতিপয় গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় যেগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান হয়ে পড়ে জরুরি। এই পরিস্থিতিতে ভাষা পরিকল্পনার ইস্যুটির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। যদিও ভাষা-আন্দোলনের মাস এলে বা শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে অনেকেই পরোক্ষভাবে বলেন ভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের কথা– কিন্তু বলা হয় না যে, অপরাপর পাঁচসালা-দশসালা পরিকল্পনার মতোই ভাষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মালয়েশিয়া ব্রিটিশ-অধিকার মুক্ত হয়ে, স্বাধীনতার অত্যল্প সময় পরেই ১৯৫৭ সনে একটা ভাষা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইংরেজি ব্যবহারের সুবিধা বজায় রেখেই সে দেশটি দশক পেরুতেই তার সুফল ভোগ করতে শুরু করে। ৮০-৯০ দশকে পৌঁছে তারা একদিকে উচ্চশিক্ষা অবধি, অন্যদিকে প্রশাসন এবং জন-জীবনে মালয়ী ভাষা (বাহাসা মেলাউ) পরিকল্পনার প্রায়-শতভাগ কার্যকরকরণে সফল হয়। সেখানে মৌসুমি-আবেগ

আর জনগণ-মাধ্যমতোষী আপ্তবাক্যের ফুলঝুরিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ সেরকম প্রকৃত-স্পৃহার সুফল পায়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এতদ্‌বিষয়ক সুচিন্তন এবং ফললাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। প্রত্যাশা থেকেছে অনেকই, কিন্তু যথার্থ রূপায়ণ বাস্তবতা তেমনি আজও অধরা। বাংলাদেশের গুটিকয়েক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী ও মাতৃভাষা দরদিগণ বিভিন্নভাবে জনসমক্ষে এবং নীতিনির্ধারক, শাসক-প্রশাসক এবং স্টেক হোল্ডারদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন ভাষা পরিকল্পনার ইস্যু এবং রূপকল্প। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি কোনো ভাষা পরিকল্পনার জন্ম এবং পল্লবায়ন ঘটেনি। মৌসুমি কিছু স্লোগান, পুনঃপুন আউড়ানো প্রত্যয় ও আপ্তবাক্য (যথা: বাংলাই হবে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের ভাষা...) সত্ত্বেও যে ক্ষমতাবানদের দ্বারা এই মহতী উদ্যোগ সূচিত এবং ফলপ্রসূ হতে পারে তাঁদেরই অনেকের কাছ থেকে শুনছি কার্যত হতাশাব্যঞ্জক প্রাক্-তত্ত্ব; তাঁরা বলেন, বাংলাদেশ তো নিরঙ্কুশভাবেই একভাষী দেশ, সংবিধানেই তো নির্ধারিত হয়ে আছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"– তা হলে আর ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজন কী? উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের আমলাগণ মনে করেন এটি সূক্ষ্মাতিক স্তরের এবং ভাষা-ব্যবহার সীমানার এক প্রান্তীয় ও সীমিত বিষয়। এঁদের মধ্যে আবার অনেকে নসিহতও করেন যে, আমাদের মতো গরিব দেশের জন্য এমনটি কোনো আশু করণীয় হতে পারে না, এর চেয়ে অনেক গুরুতর এবং জরুরি ইস্যু রয়ে গেছে।

অথচ অতীব জরুরি ছিল এদেশে স্বাধীনতার পরপরই ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক স্তরে এক কার্যোপযোগী কার্যকর ভাষা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুষ্ঠু সময়সূচি অনুসরণ করে ক্রমে-ক্রমে পর্যান্তরে তার বাস্তবায়ন। এই প্রকৃত সত্যটি কখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। যাঁরা একটু ভাসা-ভাসা ধারণা পোষণ করেন, যাঁরা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করতে পারছিলেন তাঁরা এরকম বলেই দ্রুত দায়মুক্তি হিসেবে প্রথম দিকেই নির্দেশ করে দিয়েছিলেন যে, বাংলা হলো রাষ্ট্রীয় ভাষা, ইংরেজি রইবে আন্তর্জাতিক বা বিদেশি ভাষা হিসেবে, আর ধর্মীয় ভাষা হিসেবে তো আরবি, সংস্কৃত এবং পালি থাকছেই। কাজেই পৃথকভাবে ভাষা পরিকল্পনা বা তার উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানগত দিক থেকে ভাষা পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করতে হলে ভাষা পরিকল্পনার কথা এসেই যায়। সেই বিবেচনায় উল্লেখ অত্যাবশ্যক যে, ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত প্রধান দুটি দিক থাকবে:

১। মর্যাদা পরিকল্পনা (Status planning) ২। অবয়ব পরিকল্পনা (Corpus planning)।

এই সঙ্গে প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভাষার মান্যায়ন বা ভাষা প্রমিতকরণ (Standardization)। এটি অবধারিতভাবেই অবয়ব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আর রাষ্ট্র বা

অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক সংস্থা, অপেক্ষাকৃত নতুন পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠা/মর্যাদা বিচারে অনেক ভাষার মধ্যে থেকে একটা ভাষাকে নির্বাচন/নির্ধারণ করে; তখন তা হয়ে ওঠে আত্মপরিচয় বা সত্তা পরিকল্পনা (Identity planning)।

অন্যান্য দেশের সফল ভাষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে সেই বিবেচনায় বাংলাদেশে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, মর্যাদা পরিকল্পনা সুনিশ্চিত করাই উচিত ছিল সর্বপ্রাথমিক করণীয়। তত্ত্বগতভাবে বলা যায়: ভাষা পরিকল্পনার মডেলে কতিপয় ক্রম-অনুসরণীয় পর্যায় থাকে। স্পেনের ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে ফিলিপিন্সের স্বাধীনতা লাভের পর সেগুলো অনুসরণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অতীত থেকে জানা যায় না যে, তত্ত্বগত দিক থেকে সেরকম ভাষা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হয়েছিল কি-না?

সংবিধানে নির্ধারিত রাষ্ট্রভাষা বাংলা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা ইংরেজি, সীমিত হলেও বনেদি শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বা প্রযুক্তিতে প্রধানত ইংরেজি, মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থায় আর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগে আরবি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচার পালনে যৎসামান্য সংস্কৃত ও পালি ভাষার ব্যবহার বাংলাদেশে প্রচলিত। সাধারণ বিচার- বিশ্লেষণের এই পর্যন্ত হিসেব করলে বাংলাদেশে কোনো ভাষা সমস্যা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পরিসংখ্যানগতভাবে ৯৬.৬% জনগোষ্ঠীর প্রথম বা মাতৃভাষা বাংলা হলেও এখানে ভাষা পরিস্থিতি কিন্তু সমস্যা মুক্ত নয়। সমস্যার শুরু ভারত বিভাগের পর থেকে; সেই শুরু থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তৎপরবর্তী ২-৩ যুগেও এক মূলীভূত সমস্যা বিদ্যমানই রয়ে গেছে। দেশ এখন যে সন্ধিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে স্পষ্ট হলো মাতৃভাষা/রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং প্রভাবশালী (কর্তৃত্বপূর্ণ?) বিদেশি ভাষার বিভাজনটি।

তত্ত্বীয়ভাবে নয়, কিন্তু ব্যবহার, জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এখন বাংলাদেশে আকাশ-সংস্কৃতি, অবাধ তথ্যপ্রবাহ আর ডিজিটাল প্রসারের কল্যাণে বাংলাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা। ভাষা হিসেবে সুচারু শিখন ও সাহিত্য-শিল্প চর্চায় বিদেশি ভাষার গ্রহণযোগ্যতায় কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু স্বজাতির স্বভাষার উপর আগ্রাসন সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে নিজেদের বৈভবের উচ্চমার্গীয় প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে ওঠে।

বাংলা ইংরেজির মর্যাদা: মনোভাব ও বাস্তবতা

পাকিস্তান আমলে ইংরেজির সহযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উর্দু। বাহান্নর আন্দোলনে অধিকার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপে সফলতার প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশের স্বাধিকারের বীজ উপ্ত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার জয়কার উদ্দীপনার মধ্যেও ইংরেজির পরোক্ষ কর্তৃত্ব বজায় থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্ট আদেশ দেন প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার কার্যকর করার জন্য। যথেষ্ট সংখ্যক

[বাংলায় লেখা না হলে তিনি কোনো নথি দেখবেন না বলে ঘোষণা দেন।] বাংলা ব্যবহারের সাজোসাজো রব পড়ে যায়– বাংলার সুবাতাস যেন বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু বনেদি (এলিট)গণ এবং রাষ্ট্র-প্রশাসনের কর্তা/আমলাগণ কিছু উপজাত সমস্যা হাজির করে বাংলা ব্যবহারে বৈরী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। তাঁদের প্রতিকূল যুক্তির অন্যতম ছিল– বাংলায় উপযুক্ত ও প্রশাসন- সংশ্লিষ্ট পরিভাষা এবং উপযোগী বাংলা মুদ্রাক্ষরযন্ত্রের (টাইপ রাইটারের) অভাব। এসব সমস্যা বেশি সময় ধরে থাকেনি। কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের অজুহাত, সঙ্গে চিরাচরিত অভ্যস্ত চিন্তা-চেতনার আনুগত্য এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও বৈভব সম্পর্কে অপ্রতুল জ্ঞান/ধারণার কার্য-কারণে তাঁরা বারংবার ইংরেজির আশ্রয়েই থেকে যেতে পছন্দ করেছিলেন। বনেদি কর্মকর্তাগণের পেছনে অন্তর্নিহিত এরূপ যুক্তি কাজ করেছে যে, দক্ষতার সঙ্গে বৈশ্বিক আধুনিকতা এবং অন্যান্য নিরিখে ইংরেজি অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: দেশের এই বনেদি গোষ্ঠী– যাঁদের বেশির ভাগই উঠে এসেছেন নিম্নমধ্যবিত্ত/মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে, প্রধানত বাংলা মাধ্যম শিক্ষা বুনিয়াদ নিয়ে[১], তাঁরা কেন চাইবেন ইংরেজির আধিপত্যকে লালন করতে অথবা শক্তিশালী করতে? যে ইংরেজি হাতিয়ার-কৌশল দিয়ে শতাব্দী পরম্পরায় তাঁদেরকে শাসন ও অবদমিত করা হয়েছে তার কর্তৃত্বকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হবে? এবম্বিধ প্রশ্ন কোনো ধাঁধা নয় যার জবাব দেওয়া কঠিন।

প্রকৃত বিষয় এই যে, বনেদি (এবং ইংরেজি সমর্থক নব্য-বনেদি শ্রেণি) এমন এক সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করছিলেন যার সংজ্ঞায়নটাই ছিল যে, সকল বিষয়ই উত্তমরূপে শিক্ষাদান করা হবে ইংরেজি মাধ্যমে– শুধু বাংলা বিষয়টি ছাড়া। এর ফলে উদ্ভূত হয় এক নতুন প্রজন্মের এবং ক্রমবর্ধমান এক শ্রেণির শিক্ষিত গঠিত-যুবক দলের যারা হয়ে ওঠে ইংরেজিকে সংরক্ষণের ভাগিদার। পাকিস্তান-পূর্ব আমল থেকে যাঁরা 'ইংরেজায়নে' সচেষ্ট ছিলেন যুগ-যুগান্তরে এসে বাংলাদেশকালে তাঁদের ভূমিকায় নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে এই কথিত গঠিত-দল; তাদের অন্যতম অভীষ্ট ছিল বনেদি পদবিধারী সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়া। আর নব্যধনিক গোষ্ঠী, যারা নিজেরাই বাংলা মাধ্যম থেকে উঠে আসার ফলে ইংরেজিতে ঘাটতি ও দীনতায় নিজেদের অন্তরে ম্রিয়মাণ ছিলেন, তাঁরাই নিজেদের সন্তানদের ইংরেজির মহাসড়কে সমর্পিত করতে উচ্চকিত হয়েছেন।[২]

বিগত দেড় শতাব্দী যাবৎ গোলার্ধের এই অংশের মানুষ ইংরেজির কর্তৃত্ববাদী প্রভাবকে অবধারিতই ধরে নিয়েছে। বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যমের ও-লেভেল এবং এ-লেভেল শিক্ষাদানকারী স্কুলের সংখ্যা এবং সেগুলোর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি কোনো কাকতালীয় প্রপঞ্চ নয়। বিশ্বায়নের যুগে, আই.টি বাত্যাপ্রবাহে, তথ্যের অবাধ প্রবাহের প্রাবল্যে ইংরেজি যে আপন কর্তৃত্ব অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তাতে এই ভাষা এমন এক পণ্যে পরিণত হয়েছে যে, এটি এখন দৈনন্দিন এবং অত্যাবশ্যক।

মোদ্দাকথা ইংরেজি এখন বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাধর ভাষায় পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশসূত্রে বিশ্বজুড়ে যার বিস্তার ও প্রসার (Brutt-Giffler, Janina 2002) তারও

বৃদ্ধি করেছে আমেরিকার অর্থনীতি, আমেরিকার বিশ্ব গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ ও সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ। খোদ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণও নিন্দা জানিয়ে এতে সমালোচনায় যোগ দিয়েছেন: কেউ বলেছেন, এ যেন "ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ"।[২] যার মূল কথা হলো: উপনিবেশগুলোকে এবং সদ্যস্বাধীন বা ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলোতে আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই ইংরেজিকে ব্যবহার করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে। ফিলিপসন যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো ইংরেজিকে ব্যবহার করেছে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে, উপনিবেশগুলো অথবা তাদের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলোর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য (Philipson 1992)। আবার অন্যরা বলছেন, ইংরেজি হচ্ছে 'ঘাতক বা হত্যাকারী ভাষা' (Tove Skunabb-Kangas 2000)। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্বায়ন ইংরেজি ভাষার ক্ষমতাকে বৃদ্ধিই করবে; কেননা সহজ হিসাব এই যে, যারা এই ভাষাটি ভালো জানবে, আয়ত্ত করবে তারা কর্ম-বাজারে সুবিধা পাবে।

উপরে-উপরে দেখলে মনে হবে যে, কয়েক শ্রেণির মানুষ মূলত ইংরেজিকে জারি রেখেছে তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য। ফলত বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে বিরোধ, টানাপড়েন বা উভয় সংকট, মোহমায়া/বিভ্রান্তি, স্নবারি, ছদ্ম-আধুনিকতা এবং অতি-আধুনিকতার মধ্যে বিতর্ক– এসবই অমীমাংসিত থেকে গেছে। অথচ এসব নিয়ে অনেকবার, বিগত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের মধ্যেই, বিভিন্ন ঘোষণার পুনরাবৃত্তি হয়েছে জীবনের সকল স্তরে বাংলার যথার্থ প্রচলনপ্রসঙ্গে। এই প্রচ্ছন্ন বিরোধ কথিত দুই পক্ষের মধ্যে এখনো জারি আছে।

কোথায়, কতটুকু, কেন, কীভাবে বাংলা বা ইংরেজির ব্যবহার সদর্থক ও যথার্থ তার দোলাচলে ভুগে থাকেন অনেক শিক্ষিত জন। রাষ্ট্রযন্ত্রেও অনেক স্থানেই বাংলা-বিরূপতা রয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে অবশ্য কোনো সরকারই বাংলাকে অবজ্ঞা করেননি, বরং উচ্চপদস্থগণ সর্বদাই নীতিগতভাবে বাংলার উপর জোর দিয়েছেন– কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এবং অনুশীলনে ততটা করেননি। দুর্ভাগ্য, তাঁদের বাংলা ব্যবহার নির্দেশাবলিও বাস্তবায়িত হয়নি, সঙ্গত কারণেই।

সবচেয়ে আক্ষেপ-পূর্ণ পরিস্থিতি সম্ভবত শিক্ষা ক্ষেত্রে। ত্রিভুজায়িত এক চিত্র পাওয়া যাবে সেখানটায়। নীতির অকার্যকারিতা, বিস্রস্ততা এবং চর্চার ত্রিভুজের ত্রিবিন্দু এবং ঐ ত্রিবাহুর মিলনে পাওয়া যাবে এক ধাঁধার বদ্বীপ। দেশের সিংহভাগ শিক্ষা-পদ্ধতিতে (প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে) প্রধানত ইংরেজি শিখনের সাফল্য সর্বনিম্নমাত্রিক। ধর্ম-সম্পৃক্ত ভাষা হিসেবে আরবি/সংস্কৃত/পালির চর্চা পল্লবিত নয়। ফলাফল এক সার্বিক নিম্নচাপ। ইংরেজিতে সর্বাধিক অকৃতকার্য– কিন্তু বাংলার জ্ঞান ও দক্ষতা, সেও উল্লেখ করার মতো নয়।[৩] আবার ইংরেজিতে গ্র্যাজুয়েট হয়েও যখন কোনো প্রার্থী তার আবেদনপত্রটি অথবা সাধারণ বিবৃতিটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ইংরেজিতে লিখতে পারে

না তখন শিক্ষার মান, শিক্ষাপদ্ধতি নাকি যুগের হাওয়াকে দায়ী করা হবে– তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে ত্রিভুজের তিন কোণে আমরা দেখি শিক্ষার উৎপাদী-ফলাফল, প্রশাসন এবং ভাষা ব্যবহারকে। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষিতের সীমিত বা ত্রুটিপূর্ণ বাংলাজ্ঞান, ইংরেজিতে শিক্ষালাভকারীর কৃত্রিম সামাজিক অহংবোধ এবং মাদ্রাসা-শিক্ষিতের সামাজিক মর্যাদাবোধ– এই ত্রয়ী ধারাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যফল– যার অন্তর্নিহিত উৎস-উৎপাদক কিন্তু ভাষা পরিকল্পনায় ব্যর্থ পরিস্থিতি।

অপরাপর ভাষা ও বাংলা: প্রমিতকরণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য বিদেশি ভাষার আনুষ্ঠানিক ব্যবহার নাই বললেই চলে। মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে আরবির ব্যবহারিক প্রয়োগ হলেও তা খুবই সীমিত। ফরাসি, জার্মান, জাপানি ইত্যাদি ভাষা শিক্ষার যৎসামান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি ইদানীং বিদেশি কর্মসংস্থান সুযোগের জন্য আরবি, কোরিয়ান বা চীনা ভাষা শিক্ষার প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতির এটা একটা দিক যা বহির্মুখী। কিন্তু অন্তর্ভাগে রয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যোজন। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে রয়েছে প্রধান ১৫টি উপজাতির ভাষা। এদের ভাষাকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর/জাতিগোষ্ঠীর ভাষা বললেও বাস্তবতা এই যে, এগুলোও এদেশেরই ভাষা। নানা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রকল্প-বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষার যথার্থ ব্যবহার, মান্যায়ন এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে প্রাপ্য স্বীকৃতিও এখনো অপেক্ষমাণ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের প্রারম্ভিক ও অগ্রবর্তী শিক্ষালাভে বিভাষা বাংলারই প্রাধান্য।

অথচ খোদ বাংলাই এখনো বাংলাদেশে দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ভাষা-চিন্তকদের কাছে সূক্ষ্ম অথচ ক্রমাগত জ্বালাতনকারী এক প্রসঙ্গ হলো "আমাদের বাংলা ভাষার প্রমিতকরণ"।

'ভাষা প্রমিতীকরণ' ধারণাটি বর্তমান বাংলাদেশে ততটা স্পষ্ট ও জনপ্রিয় নয় যতটা আছে এই ভাষা নিয়ে আবেগ এবং ফেব্রুয়ারির মৌসুমি কর্ম-উচ্ছ্বাস ও বাক্-উৎসারণ। সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনটি বিবেচনা এক্ষেত্রে গুরুতর হিসেবে গ্রহণ করা যায়: (১) ভাষা পরিকল্পনা, (২) লেখ্য ভাষার প্রমিতীকরণ, ও (৩) মৌখিক ভাষার প্রমিতীকরণ।

'প্রমিত ভাষা' অভিধাটি, স্বাভাবিক বিচারে, প্রাথমিক ব্যাখ্যা-সহায়ক আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনা (প্রিঅ্যামবল্) হিসেবে আসে। প্রমিত কথার আভিধানিক বিবৃতি যদি ধরি একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করা হয়েছে এমন কিছু, তবে এর অপর পিঠে থাকে মানভাষা এবং মান্যায়ন। অভিধানে দেখতে পাই প্রমিত অর্থে বলা হচ্ছে জ্ঞানত যা নিশ্চিত, নির্ধারিত বা প্রমাণিত, আর প্রমিতীকরণকে পাই 'নির্ধারিত করা' হিসেবে, যার ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ হলো Standardization।

ভাষা পরিকল্পনায় অবয়ব পরিকল্পনা এবং মর্যাদা পরিকল্পনা – এই উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা প্রমিতীকরণের ধারণা ও কর্মযোগ সম্পৃক্ত।

এই আলোচনায় প্রথমেই আসে ''মানভাষা" (Standard Language)-এর কথা। তাত্ত্বিকভাবে মানভাষা (অথবা মান্যায়িত ভাষা: Standardized Language) বলতে বোঝাবে একটি জনগোষ্ঠীতে কথিত/ব্যবহৃত এমন এক ভাষা-নিদর্শন, যা সেই গোষ্ঠী সম্মতভাবে ও জনমিতি নিরপেক্ষ বিবেচনায়, বাক্যালাপে এবং প্রয়োজনীয় আদান-প্রদান ও যোগাযোগে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এর বিকল্পে ভাষা-নিদর্শন মানভাষা হয়ে ওঠে মান্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; এই সময়টাতে এর মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, ব্যাকরণ ও অভিধানে তা বর্ণিত ও লিপিবদ্ধ হয়, সেই সঙ্গে অনুরূপ তথ্যসূত্র ভাণ্ডারে মান বা প্রমিতরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪]

সাধারণত দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলের যে স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং/অথবা সরকারের শাসনযন্ত্র কেন্দ্রীভূত হয় সেই স্থানীয়-ভাষাই কালক্রমে মানভাষা হয়ে উঠতে পারে। এর পেছনে থাকতে হয় জাতীয় আসঞ্জনের সদিচ্ছা (national desire for cohesion) এবং তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মেলবন্ধন। এই সকল বিবেচনায় একটি সর্বসম্মত ভাষা-রূপকে "মান্যায়িত" বলে ধরা যায়।

তাত্ত্বিক বিচারে মানভাষার ক্ষেত্রে ৭টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়:

১) স্বীকৃত একটি অভিধান– যাতে থাকবে 'মান্যায়িত' শব্দভাণ্ডার এবং প্রমিত বানান;

২) একটি স্বীকৃত ব্যাকরণ;

৩) মানসম্পন্ন উচ্চারণ (ভদ্র, পরিশীলিত, শিক্ষিত জনের বচন অনুসারী);

৪) ভাষা-ব্যবহার সূত্র, বিধান, ধারা, প্রথা, যৌক্তিকতা ইত্যাদি নিশ্চায়ক একটি তদারক-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠন (যেমন– Académie Française, The Royal Spanish Academy বা মালয়েশিয়ার 'দিওয়ান বাহাসা দান পুস্তকা')

৫) সংবিধান নিশ্চায়িত (আইনগত) মর্যাদা– প্রায়শই তা রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়ে থাকে;

৬) কার্যকর সর্বসাধারণীয় ব্যবহার (জাতীয় সংসদে, অফিস-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অসংবাদিত ব্যবহার);

৭) একটি 'সাহিত্যিক যথার্থতা'– যা স্বীকৃত বা প্রামাণিক রচনা হিসেবে গৃহীত ও প্রচলিত হয়।

প্রমিত রূপ নির্ধারণ

কোনো ভাষার প্রমিত রূপ কী হবে– তা নির্ভর করে একাধিক 'উৎপাদী' (factor)-র উপর। কোনো দেশ বহুভাষী হলে যেমন ব্যাপক সমস্যা, তেমনি একভাষী অথচ ভাষাটির একাধিক রূপ, আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক রূপ থাকলেও প্রমিতকরণ সমস্যা সমধিক। ব্রিটিশ

ইংরেজিতে Standard English, যা প্রমিত বা মান্যায়িত ইংরেজি হিসেবে খ্যাত, তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যযুগীয় English Court of Chancery-র আদর্শে। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজি ভাষার ঐ মান "সুশীল সমাজের" ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সামাজিক-রাষ্ট্রিক আনুকূল্য ও আভিজাত্যের কার্যকারণে তা শিক্ষিত, সুভদ্র ও উচ্চবিত্তের মানভাষা হিসেবে প্রসার লাভ করে। সুশিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা সেই মানকে ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছে। অতীত-ভারতের প্রায় ২৩টি প্রথম সারির ভাষার মধ্যে দুটি মান্যায়িত স্বরভঙ্গি (register) ''হিন্দুস্থানি" ভাষা হিসেবে আইনগত মর্যাদা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে; তার একটি ভারতে 'হিন্দি' এবং অন্যটি পাকিস্তানে 'উর্দু'। বলাইবাহুল্য যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটেছে ভিন্নতর সংঘটন।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে ভাষার কোন রূপ (variety)-টি 'প্রমিত' হিসেবে গৃহীত হবে, আর কারাই বা তা নির্ধারণ করবেন? মনে করা যেতে পারে যে, নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা তাদের ভাষা-রূপটি প্রমিত বলে নির্ধারিত হয়। বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয়। একদল সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী (Duranti 2015) বলতে চান যে, আসলে জাতীয়-রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে ভাষা প্রমিত বা মান্যায়িত হতে চাপ সৃষ্টি হয়। সবার মাঝে একটি ভাষা যদি সাধারণ (common) থাকে, সেটি যদি সকলের মাঝে সহজে বোধ্য হয় তবে সে ভাষা জনগোষ্ঠীটির সদস্যদেরকে একতাবদ্ধ করে। জাতীয় আত্ম-পরিচয় প্রকাশে ও প্রতীক হিসেবে ব্যবহারে ভাষাটিকে ব্যবহার করা যায়, এর ব্যবহারকারীদেকে একটা বিশেষ সম্মান দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যায়। মান্যায়িত করা গেলে তার দ্বারা স্কুলে শিক্ষাদানও সহজ হয়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মান্যায়িত ভাষা বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ 'ঔপভাষিক রূপকে' যদি অপরাপর রূপের উর্ধ্বে স্থান নির্বাচন করে দেওয়া হয় তবে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ পছন্দের ভাষা-রূপ, আর টিকে থাকার সংগ্রামে সেটিই আধিপত্য বজায় রাখে। মান্যায়নে বিশেষ ভাষা-রূপ নির্বাচনে সমস্যার শুরু এখান থেকেই।

আশা-প্রত্যাশা নিয়ে ভাষা-প্রতিষ্ঠান (একাডেমিগুলো) সচেষ্ট আছেন ভাষার উচ্চমান রক্ষায়; ভাষা উন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে দুরাচারী ব্যবহারের অনুপ্রবেশ রোধে তাঁরা যত্নবান হবেন– এটাই অদ্যাবধি তাঁদের উদ্দিষ্ট। বিপদ এইখানে যে অপ-ধ্বনি বা পরভাষার ধ্বনিও যথেষ্ট উদ্বায়ী (volatile) হয়ে থাকে এবং আইনগত বিধি-নিষেধেও সুবেদী হয়ে থাকে। ঐ রকম 'সিলেবল্‌কে' শেকলে বাঁধা যায় না, ধ্বনি ও শব্দের বাত্যা-প্রবাহ নিরোধ সহজ নয়, স্বাজাত্য গৌরবের উদ্‌যোগও তদ্রূপ, ব্যবহারকারীর মানসিক শক্তিও এসবকে মোকাবেলায় আগ্রহী হয় না।

বাংলাদেশের বাস্তবতা

বাংলাদেশে আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং ঔপভাষিক কারণে ভাষার প্রমিতীকরণ একটি সমস্যা বিশেষ। সমস্যাটি জটিল হয়ে ওঠে অপরাপর ভাষা-বহির্ভূত কারণে। বাস্তবতা

এমন যে, এখন নাগরিক-শিক্ষিত সমাজও প্রমিতীকরণ বা প্রমিত ভাষাকে আর দায় হিসেবে গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা ধরে রাখতে পারছেন না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তো বটেই, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ছড়িয়ে শিক্ষা-উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হচ্ছে বিকৃতি/বিপথগামিতা।

বাংলাদেশের মৌখিক ভাষার প্রমিত রূপ কোনটি অথবা তার মানই বা কী প্রকার? এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত কারণে উঠতেই পারে। বক্তব্য প্রদানের খাতিরে যদিও বলা যায় যে, মৌখিক ভাষার যে কথ্যরূপটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে/ উচ্চশিক্ষায়, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পর্যায়ে, বেতার-টিভি এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনায়, সভা-সমিতিতে এবং সুশীল-সভ্য সমাজে ব্যবহৃত হয় সেটিই বাংলাদেশের প্রমিত ভাষা, আর তারও একটা মান আছে, মানটি বজায় থাকছে– তবে সম্ভবত পুরো সত্যটি বিবৃত হয় না। সমস্যা সবচেয়ে প্রকট ধ্বনিতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তথা উচ্চারণে। আঞ্চলিক ভাষায় আবাল্য-অভ্যস্ত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েও শিক্ষক এবং উপযুক্ত পরিবেশের সহায়তা না পাওয়ায় প্রমিত উচ্চারণ-নির্ভর ভাষা ব্যবহার রপ্ত করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণও প্রমিত উচ্চারণ পারদর্শী হন না– এমনকি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নয়। এই অসুবিধা উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসমাজে, উচ্চ বিত্তবান ব্যক্তি বা আমলা-ব্যবসায়ীসহ রাজনীতিবিদদের মধ্যেও দুর্নিরীক্ষ নয়।

লেখ্য ভাষার ক্ষেত্রে সমস্যাটি ভিন্ন রকম। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শিক্ষক, সুসাহিত্যিক অথবা বাংলায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনেকেই বাংলা লেখায় পারদর্শী। তাঁদের বাংলায় প্রমিতির সমস্যা না থাকলেও সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, আমলা, ব্যবসায়ী, ইংরেজি-মাধ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তির লেখায় সমধিক সমস্যা বিরাজমান বাংলার প্রমিত ব্যবহারে। সেগুলোর বৈচিত্র্য উপস্থাপন আলোচনাকে দীর্ঘ করবে; উল্লেখ্য কতিপয় মাত্র উদাহরণ আনা যায়:

১. নামকরণে যেখানে বাংলার সুন্দর ব্যবহার হতে পারে সেখানে পদবি, প্রতিষ্ঠান, সমিতি, কর্ম-সংস্থা, পরিষেবা, নতুন এলাকা ইত্যাদি অনেক কিছুর নামই অনুপযুক্ত-বাংলায় অথবা সরাসরি ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে। আইনগত বাধ্যবাধকতা কী থাকে তা সকল ক্ষেত্রে জানা যায় না, কিন্তু পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, নবপ্রণীত আইন/অধ্যাদেশ ইত্যাদি কি প্রমিত বাংলায় হতে পারে না? তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের সমিতির নাম কেন ইংরেজিতে [Farmars' Association/Farmars' Bank] হবে– বাংলার প্রমিতীকরণ প্রশ্নে মনে হয় তার জবাব নেই।

২. লেখ্য ভাষায় বানানে বিভ্রান্তি ও বাক্যগঠনে দূরান্বয় দুষ্টতা বাংলার পুরনো সমস্যা। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তমান বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা লিখনে ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার ঘটছে– এটা সাম্প্রতিক সমস্যা।

৩. সবচেয়ে অধিক স্বেচ্ছাচার ঘটছে সম্ভবত 'গণমাধ্যমে'। দৃশ্য-মাধ্যম টিভি,

চলচ্চিত্র, ভিডিও থেকে শুরু করে বিলবোর্ড, নামফলক (সাইন বোর্ড), দেওয়াল লিখন, রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানের নাম, বিভিন্ন নির্দেশিকা, পোস্টার, ব্যানার, প্রচারপত্র, ইস্তেহার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশিত/প্রচারিত ভাষায় যে স্বেচ্ছাচার ও অযত্ন দেখা যায় তাতে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। ভাষা ক্রম-পরিবর্তনশীল হলেও এমনটি মেনে নেয়া যায় না যে, ভাষার কোনো মৌলিক শৃঙ্খলা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে না। সবচেয়ে শঙ্কার কথা হলো: শিশু এবং নতুন প্রজন্ম এসব অ-প্রমিত প্রয়োগ থেকে ভুল শিখছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে।

করণীয়

কী করা যেতে পারে– এ প্রশ্নে প্রথম যে সমস্যা তা হলো যাঁরা বা যে সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ এই মহৎ কর্মটি কার্যকরভাবে শুরু করে কর্মযোগকে সচল রাখবেন তাঁদেরকে প্রথম পুরো সম্পাদনটি সম্পর্কে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বলেই নিম্নরূপ চিন্তা করা যায়:

১. এতদ্‌বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পক, সংগঠক/প্রশাসক এবং সহায়তাদানকারী আমলাদের সমবায়ে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ প্রয়োজন। অতীতে সরকারি পর্যায়ের 'বাংলা প্রবর্তন সেল' কেন বিশেষ অবদান ধরে রাখতে পারেনি, তা খতিয়ে দেখা যায়।

২. পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণ অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশেষ ও ব্যাপক কর্মযোগ হতে বাধ্য: কিন্তু তার প্রায়োগিক ভিত্তির "আভাষ" এই পর্যায়ে এভাবে প্রকাশ করতে পারি। (ক) প্রমিত একটা বাংলা ব্যাকরণ– প্রথমেই স্বীকৃত হতে হবে। বাংলা একাডেমি এক বৃহৎ কর্মোদ্যোগে এরকম একটি প্রকাশনার সূচনা করেছে, যদিও এটির সর্বজন গ্রহণযোগ্যতার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। (খ) প্রমিতীকরণে ব্যাপক কর্মযোগ কোনো একক সংস্থার দায়িত্বে সমন্বিত হতে পারে, কিন্তু অবদান রাখবে যেসকল প্রতিষ্ঠান, যথা– বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাক্রম পর্ষদ, গণমাধ্যম সংস্থা ও ইনস্টিটিউট (বিজ্ঞাপনী সংস্থা এতে অন্তর্ভুক্ত), জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের "ভাষা সেল", IT ক্ষেত্রের সফ্‌টওয়ার উদ্যোগীগণ– এঁরা সক্রিয়ভাবে কর্মযোগে অন্তর্ভুক্ত না হলে সফলতা আসবে না।

৩. বিশেষ দৃষ্টি এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ-ব্যবহার ও শব্দ-সৃষ্টিতে।

৪. একটি পরিবীক্ষণ (বা তদারকি) ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর ও সচল রাখার জন্য অপরাপর করণীয় নির্ধারণ করতে হবে পরিপ্রেক্ষিত ও পরিস্থিতি অনুসারে।

৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টিকে বাদ দেওয়া যায় না; তবে সেই আলোচনার উপযুক্ত এ্যাভিন্যু ও প্ল্যাটফর্ম সম্ভবত এটা নয়।

প্রত্যাশা

এই সকল বিচার-বিবেচনার পর আমাদের প্রত্যাশা বহুধারিক, বহুমুখী। প্রাথমিক, সরল ও বৃহত্তর প্রত্যাশা এইরূপ যে, জাতীয় পর্যায়ে জীবনের সকলস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ, ব্যবহার ও মর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটুক। নীতিগত বা তত্ত্বগতভাবে বৃহত্তর এরূপ প্রত্যাশার মধ্যেও অনু-প্রত্যাশা-উপ-প্রত্যাশাও থাকে যে, আধুনিক বিশ্বের দিকে দ্বার-উন্মোচক আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিরও ব্যাপকতর সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, বিশ্বের বাণিজ্য ও ভূ-রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্রে ইংরেজির হাতিয়ার ব্যবহার করেই আমাদেরকে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। ধর্মীয় জীবনাচারের জন্য আরবি (এবং সংস্কৃত বা পলির) ব্যবহার তো থাকবেই, কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে ও বিদেশি ভাষা হিসেবেই আরবি– এমনকি মালয়ি, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষা শিক্ষণও প্রত্যাশিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর) ভাষার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতি সাধনে এখন আর কোনো মহল সমর্থন না দিয়ে থাকবেন না। কিন্তু ভাষা বাংলার কোনো অমর্যাদা হোক এমনটিও কেউ চাইবেন না। এখানেই প্রশ্ন যে মর্যাদাবোধ কি আপেক্ষিক কিছু? নাকি এটা মাত্রার হেরফেরের ব্যাপার অথবা রকমফেরের বিষয়? অথবা এ-ও বলা যায় অনুভব ও আচরণীয় বিষয়। আমার ভাষার মর্যাদার ইস্যুটি আমি কি বাস্তব জীবন ও বৈশ্বিক প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করব?

একদিকে স্বকীয়তা বোধ আর অন্যদিকে বাস্তব প্রয়োজন ও চাহিদা– এই দ্বিধারিক প্রবাহের লব্ধিতে বর্তমান বাংলাদেশে ভাষা পরিস্থিতি প্রত্যাশা মনে হয় আবর্তিত।

তথ্য নির্দেশ

১. অথবা অত্যল্প সংখ্যক হয়তো ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষালাভ করলেও বিদ্যালয়ে বাংলার যথেষ্ট প্রভাব ও সম্পাত তাদের উপর ছিল ।

২. ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলেই 'সিভিল সার্ভিস' (আমলাতন্ত্র) এবং সামরিক বাহিনীকে পুরোমাত্রায় 'ইংরেজিকৃত' করা হয় যার দ্বারা ওই প্রজন্ম ১৯৭১ অবধি স্বপ্রতাপে আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে (Cohen 1994)। এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। ইংরেজি প্রাধান্য জারি রাখার ক্ষেত্রে এই বনেদি দলের সদস্যদের একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল; এতে সাধারণ ভদ্রসমাজ এবং আমজনতার উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধিকার বজায় থেকেছে, আবার বাংলা মাধ্যমে বা প্রথাগত দেশীয় আচারে শিক্ষিত প্রতিযোগীদের উপর বাড়তি সুবিধালাভ করা গেছে– সর্বোপরি, সম্ভবত সাংস্কৃতিক উচ্চাঙ্গতা (যারা আবার অধস্তনবর্গকে অবজ্ঞা করাতে এবং উচ্চতর বর্গের মোসাহেবিতে যত্নশীল ছিল) দ্বারা নিজেদের এক পৃথক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত বলে আত্মম্ভরিতায় তুষ্ট থেকেছে।

৩. ক্যাডারভুক্ত বনেদি চাকরির জন্য আবশ্যিক বাংলা পরীক্ষায় প্রার্থী-সাধারণের বাংলা জ্ঞান ও দক্ষতা আমরা আশাব্যঞ্জক পাইনি, কখনো তা ছিল সকৌতুকী ও হতাশাব্যঞ্জক।

৪. বাংলা ভাষার গঠমান আধুনিক যুগ-পর্যায়ে ভাগীরথী উভয় তীরের জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা থেকে পরবর্তীকালে সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও সরকারি শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রীভবনের ফলে,

কলকাতায় সুমার্জিত-শিক্ষিত জনের মুখের ভাষার পরিশীলন-অনুশীলনে প্রচলিত হয়েছিল বাংলার প্রথম মানভাষা।

সূত্রপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ূন (১৯৯১)। *বাংলা ভাষার শত্রু মিত্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নাথ, মৃণাল (১৯৮৯)। *সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা*, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা।

মুসা, মনসুর (১৯৮৪)। "ভাষা পরিকল্পনা", ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, মুক্তধারা, ঢাকা।

হক, মহাম্মদ দানীউল (২০০৩)। "ভাষা পরিকল্পনা : বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি", বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনসস্টিটিউট প্রকাশনা, ঢাকা।

Brutt-Giffler, Janina 2002. *World English: A Study of Its Development*, Multilingual Matters Ltd. Clevedon.

Cohen 1994, Cohen, Stephan p. 1994. *The Pakistan Army*, Oxford University Press, Karachi.

Duranti, Alessandro (2015). *The Anthropology of Intentions: Language in a World of Others*. Cambridge University Press.

Haugan, E. (1972). "Language Planning : Theory and Practice". In *Advances in the Society of Language*. Vol.II, the Hague: Mouton.

Philipson, Robert (1992). *Linguistic Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Rahman, Tariq. 1999. Language, *Education and Culture*, Oxford University Press, Karachi.

Roy, P.S. (1961). 'Language Planning'. Quest No. 31: Oct-Dec.

Rubin, J. & Jernudd, B.H. (1971). *Can Language be Planned*?, University of Hawaii, Honolulu.

Skutnabb-Kangas; Tove 200. Linguistic Genocide In Education or Worldwide Diversity and Human Rights, Lawrence Erlbaum, London.

Tauli, Valter (1964). 'Practical Linguisti: The Theory of Language Planning', In Lunt and Horace (eds.), Proceeding of the Ninth International Congress of Linguistics, Cambridge. The Hague & Paris : Mouton.

Tove Skunabb-Kangas 2000. Skutnabb-Kangas,Tove (2000). **Linguistic genocide in education - or worldwide diversity and human rights**? Mahwah, NJ & London, UK: Lawrence Erlbaum Associates, 818 pp.

Weinstain, B. (1980). "Language and Language Planning in Francophone Africa". In *Language Problem And Language Planning*. 4:1, 55-77.

বাংলা প্রমিত উচ্চারণ : দুই বাংলার সহযোগ

উদয়নারায়ণ সিংহ*

০. গোড়ার কথারও আগে

ভাষা যে বহতা নীর তা আর নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। তবে এই উপমহাদেশে যে-মাতৃভাষার জন্য আমরা বাংলা-ভাষীরা প্রাণ দিয়েছি তার বাক-প্রান্তরের ধমনী ও শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। আর নদীর চরিত্রেই আছে ক্রম-বর্তন– চলতেই থাকা, যে-কোনো একটি অবস্থানে স্থাণুর মতন স্থির না থাকা। তবে আমরা যেহেতু ভাষার শরীর-চর্চা বা সৌন্দর্যায়ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য সম্মিলিত হয়েছি, তাই ভাষার শরীরের তন্ত্রের বিষয়ে দু-চার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার কথা শুরু করব। তবে প্রথমেই আমার আজকের প্রবন্ধের বিষয় কি নয়, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

১. প্রাথমিক কথা

প্রথমত, আজকে আমি বাংলা উচ্চারণ ও বানানের সংযোগ নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না। আমি জানি বাংলা বানান একটা স্পর্শ-কাতর জায়গা এবং সম্ভবত এ-বিষয়ে ঔচিত্য ও উপায়– বিশেষ করে প্রমিতির পথে হাঁটতে গেলে– এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অগ্রণী ভাষাবিদ পবিত্র সরকার পরবর্তী পর্যায়ে কথা বলবেনই। এপ্রসঙ্গে হালে একটি বাংলা ব্লগ-এ পড়ছিলাম [শাবা-র (শামীমুল বারী) লেখা– 'বাঁধ ভাঙার আওয়াজ', নির্বাচিত পোস্ট; ২য় পর্ব–'বাংলা বানান : আসুন এক ছাতার নিচে'] যেখানে আছে একটি কাল্পনিক সংলাপ, যা এই রকম:

"বলুন তো চীন হবে নাকি চিন হবে।"
বানান বিশারদদের একদল সাথে সাথেই বলবেন, চিন হবে। কারণ এটা বিদেশি শব্দ। কিন্তু অপর একদল বলবেন, নাহ, চীন হবে। কারণ এটা তৎসম শব্দ, অন্য বিদেশি শব্দ নয়। সংস্কৃতে চীনাংশুক বলা হয়েছে বলে এর বানানও হবে চীন।"

এর মধ্যে যে জটিলতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে, আর তাই সাধারণ মানুষ যে তাই নিয়ে বেশ

* অধ্যাপক, রবীন্দ্রভবন, বিশ্ব-ভারতী, শান্তিনিকেতন (ভারত)

দুশ্চিন্তিত তা বোঝা যায় শামীমুল বারীর পরবর্তী মন্তব্য থেকে: "বিতর্কের ধরনটা কত বিচিত্র।"

এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের অরুণ সেন, তিনি বলেছেন, যে-শব্দকে কোনো অভিধানে তৎসম বলা হয়েছে, সেই শব্দকেই হয়তো অন্য অভিধানে তদ্ভব বা এমন কী কখনো বিদেশি বলে গণ্য করা হয়েছে। ('বানানের অভিধান : বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন একটি প্রস্তাব'–অরুণ সেন ১৯৯৩:৫২, প্রতিক্ষণ, ডিসেম্বর)।"..."বাংলা বানান নিয়ে অসংখ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, বিতর্ক হয়েছে। এখন আর নয়। সবাইকে এক ছাতার নিচে আসতে হবে। আমরা বাংলা বানানের সার্বজনীন (সর্বজনীন?) প্রমিত রূপ দিতে পারলে আর বানান পরিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামানো লাগবে না। তখনই বাংলা ভাষা একটি চিরন্তন রূপ লাভ করবে।
[http://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/shabaabdullah/29934252]
'বিলেতের অতিথি' শীর্ষক একটি কাগুজে নিবন্ধে সঞ্জয় দে এ-বছরের ২৯শে জুলাই ব্রিকলেন- পাক্ষিকে একটি লেখায় (আলোর আল্পনা : আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন লন্ডনে হাইকমিশনার মিজারুল কায়সের কথা, যিনি ঠিক এই বানানটি নিয়েই অধ্যাপক আবু সায়ীদ-কে জিজ্ঞেস করাতে উনিও বললেন: "'ঈ'-এর ব্যবহার তুলে দেওয়াই উচিত কারণ বাংলা ভাষাকে সহজতর করা দরকার।"

দ্বিতীয়ত, আমি ভিন-দেশি শব্দ-সম্পদ বাংলায় কীভাবে উচ্চারিত হয়, হবে, বা হওয়া উচিত– সেই ব্যাপারে মন্তব্য করতে আজকের প্রপত্রের অবতারণা করিনি। এই প্রসঙ্গে দেখেছি 'আলোকিত বাংলাদেশ' কাগজের ১৯শে আগস্ট ২০১৩ সংখ্যার একটি লেখা ও কয়েকটি প্রশ্ন যা খুবই সময়োচিত ও যুক্তিযুক্ত সমস্যা æ æর দিকে ইঙ্গিত করে– যেমন পড়লাম সাইদ আহমেদের কলমে এই ক'টি কথা যার বিষয় হল 'বাংলা একাডেমী' নাকি 'বাংলা অ্যাকাডেমি' : "বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি। সে সবের মধ্যে academy অন্যতম। শব্দটিকে আমরা উচ্চারণ করি অ্যাকাডেমি হিসেবে, যদিও সঠিক ইংরেজি উচ্চারণ অ্যাক্যাড্যামি। বেশ দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য উচ্চারণ। বাংলা শব্দের আদিতে 'অ্যা' এবং অভ্যন্তরে 'a'-এর উচ্চারণ ইংরেজি cat শব্দের 'æ'-র মতো। বাঙালি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরপর 'অ্যা' উচ্চারণ করে না। তাই তার সহজাত দ্রুত উচ্চারণ কৌশলে অ্যাক্যাড্যামি হয়ে যায় অ্যাকাডেমি। সুতরাং ইংরেজি যেসব শব্দে 'অ্যা' ধ্বনি রয়েছে, সেখানে উচ্চারণটি সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য সেসব শব্দের বাংলা বানানে প্রতিবর্ণীকরণ বা transliteration-এর নিয়ম রক্ষা না করে, সেখানে ধ্বনিসঙ্গত বানান লেখাই উচিত। তাতে ইংরেজি শব্দের একটি গ্রহণযোগ্য উচ্চারণও শেখা হয়ে যায়।" এর পর পরই উনি অভিযোগ করলেন– "ইংরেজি acid শব্দকে বাংলায় অ্যাসিড বানানে না লিখে এসিড বানানে লেখায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ acid-কে এসিড acid (এসিড) উচ্চারণ করেন। পুলিশের এক আইজিকে টেলিভিশনে অ্যাক্সিডেন্ট (accident) শব্দকে এক্সিডেন্ট (eccident) বলতে শোনা গিয়েছিল। এর মূলেও ওই

এক্সিডেন্ট বানান। সুতরাং গ্রহণযোগ্য উচ্চারণের স্বার্থেই বাংলায় বহুল ব্যবহৃত academy, accountant, advocate, approach, avenue, magistrate ইত্যাদি শব্দের বাংলা বানান হওয়া উচিত অ্যাকাডেমি, অ্যাকাউনট্যান্ট, অ্যাডভোকেট, অ্যাপ্রোচ, অ্যাভিনিয়ু, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি। ....আবার বাংলা বানানে এর বিপরীতটিও দৃশ্যমান। যেখানে 'অ্যা' উচ্চারণ আসবেই না, আসবে 'এ' উচ্চারণ, সেখানে 'অ্যা' বানান লেখা হচ্ছে। যেমন-'cable' শব্দ। এর বাংলা গ্রহণযোগ্য উচ্চারণ 'কেবল'। কিন্তু লেখা হচ্ছে 'ক্যাব্‌ল'। 'ব'-এর নিচে আবার একটি 'হস্' চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে, যার কোনোই প্রয়োজন নেই। ইংরেজি উচ্চারণ অবশ্য কেইবল।
[http://www.alokitobangladesh.com/editorial/2013/08/19/17130]

তৃতীয়ত, কীভাবে উচ্চারণ অথবা যাকে বলা যায় প্রমিত/মানক উচ্চারণ সে-বিষয়ে শিক্ষা দেবো, তার সবিস্তার আলোচনা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কর্মশালার বা ওয়ার্কশপের বিষয় হতে পারে। আর এ-নিয়ে অনেক লেখাই দেখতেও পাওয়া যায়; যেমন, মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বিশেষ রচনা : 'শুদ্ধ উচ্চারণের শিক্ষা', উম্মে মুসলিমা-র ২০১৪–য় লেখা নিবন্ধ যা শুরু হচ্ছে এইভাবে: "শিক্ষক প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়াচ্ছেন, 'আচ্ছা বল দেখি– ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিচয়– এর মানে কী? শিশু শিক্ষার্থীরা ওর একটা শব্দও বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে থাকে। শিক্ষক তখন আঞ্চলিক ভাষায় বুঝিয়ে বলতে থাকেন, 'আরে বোকার হদ্দরা, ফুটিয়াছে মাইনে ভ্যাটকাইছে আর সরোবর মাইনে? হরোবর। মাইনে জানছ না? তগো বাড়ির বগলে ডোয়াডুয়ি (ডোবা ডুবি) নাই?' আর 'ক-ল-স-ঠিলা' এ গল্প অনেকেরই জানা । # # মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের সময় উচ্চারণের শুদ্ধতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে নিয়োগ নিশ্চিত করা কর্তব্য। কারণ শিক্ষকদেরই মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। পাঠদানের পাশাপাশি নির্মল চরিত্র গঠনের উপদেশ যেমন, তেমনি শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার শিক্ষাও কম না। বিশেষ করে যে দাম দিয়ে আমরা যে ভাষা কিনেছি, সেই বাংলা ভাষা উচ্চারণের হেলাফেলায় হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।" [http:/ /www.skdeendunia.com/? p=2100]

তবে এই তৃতীয়োক্ত বক্তব্যের রেশ ধরে আমরা আজকের আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। যে প্রশ্নটা আমাকে ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক দুটি ভূমিকাতেই ভাবায় তা হলো ভাষার 'শুদ্ধতা', 'বৈধতা' ইত্যাদি অবধারণার ভিত্তিতে আমাদের নিজেদেরকে কতটা regimentation বা অনুশাসন-বদ্ধতার শিকার হয়ে ভাষা-সমাজে থাকতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার এই শুদ্ধি, সুচিন্তা ও শুচিবাই ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ জাগে। আজ যা মনে হয়- এভাবে কথা বলা 'নৈব নৈব চ', দেখা যাচ্ছে কাল সমাজের সর্বস্তরের মানুষজন– বিশেষ করে বৌদ্ধিক সম্প্রদায়– সেইভাবে ও সেই ভাষাতেই কথা বলছেন। অর্থাৎ শুদ্ধি বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারা মুশকিল। শুদ্ধবাদীরা অবশ্য বলবেন, দেহ-মন-বাণী– তিনটিরই বিশুদ্ধি একান্তই আবশ্যক এবং তার সপক্ষে বাইবেল থেকে, বেদ-কুরআন শরীফ, জেন্দ-আবেস্তা, গ্রন্থ-সাহিব কিংবা তোলকাপ্পিপয়াম– সব গ্রন্থ থেকেই যুক্তি

উপস্থাপন করবেন। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজি অনুবাদে বাইবেল-এর Timothy 4:12-তে বলা হচ্ছে : "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity." তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম ও জাপানি বৌদ্ধধর্মে যে তিনটি বজ্র-এর কথা বলা হয়- তিব্বতিতে যাকে বলা হয় 'gsang ba gsum', তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো বাক্ বা বাণীর শুদ্ধি- rdo rje'i gsung. জৈনরাও বলছেন জীবের মোক্ষ-লাভের পদ্ধতির কথা যার জন্য কর্মের মাধ্যমে যে 'লেশ্যা' মানুষের আত্মনকে বিভিন্ন ধরনের ভুল করতে বাধ্য করে বা যে আস্বর বা বন্ধ মানুষকে নানান 'কর্ম' করতে বাধ্য করে (তত্ত্বার্থসূত্র-এ ওঁরা প্রায় ১০৮টি এই ধরনের কর্ম-এর কথা বলেন) তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাণীর বিকৃতি বা অশুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের উপর আস্তরণ ফেলে দেয়, দর্শনকে ঝাপসা করে দেয়, এবং আয়ু, অনুভব প্রভৃতিকে নানান কর্মের দিকে প্রেরিত করে- যার ফলে বারবার জন্ম নিতে হয়, মুক্তি হয় না।

বিভিন্ন ধর্মের আলোচনার তত্ত্বকথার কচকচিতে না গিয়েও বলা যায় যে, ধর্মে ভাষার পবিত্রতা বা বাক্- শুদ্ধির উপর সব দেশেই ও সব কালেই জোর দেওয়া হয়েছে- মূলত এই জন্য যে, এখানে সমাজ-নির্মাণে ও সামাজিক গতিবিধির পরিচালনায় একটা দ্বিত্ব বা dichotomy কাজ করছে যেখানে মানুষকে দুটি করে বিকল্পের থেকে একটি বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে- তাই এখানে যেই মিথ্যাকে সত্যের বিপরীতে রাখা হচ্ছে বা মধুরকে কর্কশের বৈপরীত্য হিসেবে ভাবা হচ্ছে আর ঠিক তখনি শুদ্ধি-অশুদ্ধির প্রশ্নটির অন্য একটি dimension ফুটে উঠছে। তাই ধর্মভীরু ধর্মকাতর ও ধর্মচিন্তক মানুষজনকে কোনো দুঃখ না দিয়েও আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমরা যে উচ্চারণের বিধি ও তার বিশুদ্ধ পালনের কথা শুনে-বলে থাকি, তার সঙ্গে এই দার্শনিক শুদ্ধি ও শুচিতার কোনো সম্বন্ধ নেই। অতএব, চতুর্থত, আমরা বিষয়টিকে এই দিক দিয়েও দেখতে চাই না।

তাহলে আমরা কীভাবে বিষয়ের বিস্তারে যাব? সেটা চিন্তার বিষয়। শুরু করা যাক কিছু স্বীকৃত সত্য দিয়ে।

২. সাধারণীকরণ প্রসঙ্গে দু-চার কথা

সাহিত্যে যেমন সকল কথার শুরুতে আমরা তাঁর নিজ মহিমায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কথা শুরু করি, বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও কবির কিছু অসাধারণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন– "অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন: "অতি কলু ঘড়ি কল্য মরু দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব-ও বলিলেও হয়।" লক্ষ করুন, এখানে নিয়মাবলি শুধুমাত্র আপেক্ষিক অথবা কোনো পরম সূত্রাবলির অংশ নয়- সবই যেন সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রবণতা (statistical probability) মাত্র। কবির লেখা নিয়মাবলি ব্যবহারিক দিক থেকে তৈরী- যার সঙ্গে

আজকের কট্টর ভাষাবিজ্ঞানীদের মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তাঁর প্রায় শতবর্ষ পরে এবং মুনীর চৌধুরী এবং আবদুল হাইয়ের জমানা পেরিয়ে আমরা দেখছি BRAC–এর ওয়ার্কিং পেপারে (২০০৪-০৭) Ayesha Binte Mosaddeque, Naushad UzZaman, and Mumit Khan-দের 'Rule based Automated Pronunciation Generator' এই শীর্ষক নিবন্ধে অনেক সাধারণীকরণের মধ্যে একটি এই রকমের: "In terms of generating the pronunciation of Bangla graphemes a number of problems were encountered. Consonants (expect for শ '/ʃ/' and স '/s/') that have vocalic allographs (with the exception of ('/e/') are considerably easy to map. However there are a number of issues: Firstly, the real challenge for a Bangla pronunciation generator is to distinguish the different vowel pronunciations. Not all vowels, however, are polyphonic. অ '/ɔ/' and এ '/e/' have polyphones ('/ɔ/' can be pronounced as [o] or [ɔ], '/e/' can be pronounced as [e] or [æ], depending on the context) and dealing with their polyphonic behavior is the key problem. Secondly, the consonants that do not have any vocalic allograph have the same trouble as the pronunciation of the inherent vowel may vary. Thirdly, the two consonants শ '/ʃ/' and স '/s/' also show polyphonic behavior. And finally, the 'consonantal allographs' (য /ɟ/, র /r/, ব /b/, ম /m/, and the grapheme য় '/j/' complicate the pronunciation system further. Hypothetically, all the pronunciations are supposed to be resolved by the existing phonetic rules." এদিকে রবীন্দ্রনাথ য-ফলার সহজ নিয়ম বের করেছিলেন: "যফলা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ য ফলা ই এবং অ-এর যোগমাত্র ।

উদাহরণ, গণ্য দন্ত্য লভ্য ইত্যাদি।"

আয়েশা, নৌশাদ ও মুমিত খানের সাধারণীকরণের অঙ্গ রূপে যে ৫৮টি ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রাবলি (Phonetic rules) ও তিনটি উদাহরণাত্মক অনুভব-নির্ভর সূত্রাবলির (Heuristic Rules) অবতারণা করা হয়, তার উদ্দেশ্য অতি সাধু-স্বচালিত উচ্চারণ প্রজনক (অটোমেটেড প্রোনানসিয়েশান জেনারেটার) বা APG-র নির্মাণ যার নানান বাণিজ্যিক, ব্যবহারিক ও অ্যাকাডেমিক প্রয়োগ সম্ভব।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে 'বাংলা কথ্যভাষা'-র প্রসঙ্গটি উঠবে এতে আর আশ্চর্যের কী? এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এখানে শুধু ইটিমোলজি বা ব্যুৎপত্তি-বিদ্যা ঘেঁটে লাভ হবে না- বলছেন: "বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। অনেক বাংলা শব্দের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারিত শব্দগুলি মিলাইয়া

দেখিলে সেই মূল ধরিতে পারা সহজ হইতে পারে।" অর্থাৎ উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করতে হলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কারণ উনি যেহেতু এমন একটি শিক্ষায়তন গড়ার কাজে আত্মনিয়োজিত করেছিলেন যেখানে বাংলার বিভিন্ন জেলার থেকে ছাত্র-ছাত্রীর সমাগম হত, "স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির কী নিয়মে বিকার ঘটে তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচার্য।"

আয়েশা, নৌশাদ ও মুমিত খানদের আগেই রবীন্দ্রনাথ প্রমিত উচ্চারণের সূত্র-সন্ধান করতে গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় কথা আমাদের বললেন– ওঁর কাছে প্রমিত উচ্চারণ বলতে কলকাতা অংশের বা বিভাগের বাংলা: "কলিকাতা বিভাগের শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক। যখন 'বালক' পত্র প্রকাশ করিতাম সে অনেক দিনের কথা। তখন সেই পত্রে বাংলা শব্দোচ্চারণের কতকগুলি নিয়ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। আমার সেই আলোচিত উচ্চারণপদ্ধতি কলিকাতা বিভাগের। স্থলবিশেষে বাংলায় অকারের উচ্চারণ ওকারঘেঁষা হইয়া যায় ইহা আমার বিচারের বিষয় ছিল। 'করা' শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ এবং 'করি' শব্দের ক্-সংলগ্ন অকারের উচ্চারণ তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে– এ উচ্চারণ কলিকাতা বিভাগের সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কলিকাতার উচ্চারণে 'মসী' শব্দস্থিত অকার এবং 'দোষী' শব্দস্থিত ওকারের উচ্চারণ একই। 'বোলতা' এবং 'বলব' ও সেইরূপ।" লক্ষ করতে হবে- উনি দুই ধরনের 'ও'-ধ্বনির কথা বলছেন উচ্চার্য শিষ্টজনের ভাষায়: "বাংলা উচ্চারণে কোনো ওকার দীর্ঘ কোনো ওকার হ্রস্ব; হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার দীর্ঘ এবং স্বরান্ত শব্দের পূর্ববর্তী ওকার হ্রস্ব। 'ঘোর' এবং 'ঘোড়া' শব্দের উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ্য করিলেই ইহা ধরা পড়িবে। কিন্তু যেহেতু বাংলায় দীর্ঘ-ও হ্রস্ব-ও একই ওকার চিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে সেইজন্য নিম্নের তালিকায় এইসকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম না।"

৩. উচ্চারণ : কিছু স্বীকৃত সত্য

তবে আমরা যদি বৈয়াকরণিক কচকচির মধ্যে নাও ঢুকি, এ কথা এখন স্বীকৃত সত্য যে, উচ্চারণ স্থান-ভেদে, কালের ফারাকে আর বার্তালাপের উদ্দেশ্য-অনুযায়ী পৃথক পৃথক হয়, ফলে নানা ধরনের বাংলা আছে। অবশ্য কিছু দিন আগেও অনেক রাগী মাস্টার-মশাইয়েরা মনে করতেন– এমনটা হওয়া কোনো সুস্থ লক্ষণ নয়। বরং এ-বিষয়ে ২০১০ সালের একটি ফেইসবুক পোস্টে যে মন্তব্য দেখেছি বাংলাদেশ থেকে, তার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন যে, ভাষার উচ্চারণ-ভেদ নিয়ে শ্রোতাদের যে একটা সহ্যের পরিমাপ বা tolerance parameter রয়েছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। তামীম শাহরিয়ার সুবীন লিখছেন, যা অনেকেরই মনের কথা: "আমার কান এখন অনেক রকম গানই সানন্দে গ্রহণ করে। 'তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসনি' গানে 'আসনি' বলার সময় শচীন দেবের কণ্ঠের টান শোনার জন্য আমার কান খাড়া হয়ে থাকে। গানটায় উনি এই শব্দটা এক এক বার এক এক রকম ঢংয়ে উচ্চারণ করেন।" (May 17; 'সাধনা').

[https://www.facebook.com/notes/tamim-shahriar-subeen]

এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব'-এর 'বাংলা উচ্চারণ' নিবন্ধে উনি প্রথমে ইংরেজি ভাষার লেখ্য ও কথ্য রূপের পার্থক্যের কথা দিয়ে শুরু করে বাঙালি শিশু-কিশোরদের বানানের ও তৎসঙ্গে উচ্চারণের ফারাকের জন্য যে হিমশিম খেতে হয়, সে-বিষয়ে হাস্যচ্ছলে কিছু কথা বলে সরাসরি চলে যান বাংলা উচ্চারণ-প্রসঙ্গে এবং প্রথমেই মেনে নেন যে, বাংলার লিপি-বিন্যাস ও তার ধ্বনি-রূপে উত্তরণ নিয়েও সমস্যা রয়েছে:

"পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন, ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এ ছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ৯ঙঞ-গুলো কেবল সঙ সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্-না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংল্যাণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।"

রবীন্দ্রনাথ এও বললেন যে, "বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গি আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।" সমস্যা হচ্ছে, আজ– শব্দতত্ত্বের একশ বছর পর, বিশেষত ভাষার ভিত্তিতে বাংলার জন্য একটা গোটা দেশ তৈরি হয়ে যাওয়ায় স্পষ্টতই 'রাজধানী'র হিসেবটা এখন বদলে গেছে। ফলে ভাষা ও সাহিত্য একটি কিন্তু ভাষার তৈরি হয়েছে দু-দুটি epicentre, সংগত কারণেই কোলকাতা ও ঢাকা। এহ বাহ্য- কিন্তু সেই সময়ে কবি মনে করলেন– "বাংলাভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা। আমার কাছে তখন খানদুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম । এই-সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ ফুরিয়া গিয়াছিল।"

তার পরের গল্প আমরা সবাই জানি– কি করে একটি ছোট শিশু অপ্রয়োজনীয় মনে করে সেই সব উচ্চারণের সূত্রাবলির খসড়া ফেলে দিয়ে তার বদলে বাক্সে কিছু কাজের জিনিস– অর্থাৎ, খেলার পুতুল রেখে দিয়েছিল।

ঠিক যে-কারণে ইংরেজি উচ্চারণ বাঙালির কাছে বিভীষিকাময় কারণ আমরা বানান থেকে উচ্চারণ অর্থাৎ লিপি থেকে ধ্বনির রূপান্তরের দিকে এগোতে চাই, সেই কারণে না-হলেও (সেই কারণে নয় কারণ বাংলা হরফ তো ধ্বনি-মাত্রিক), বাংলা উচ্চারণও বেশ গোলমালের জায়গা– যে শিখছে তার কাছে। তাই মনে পড়ছে উনি শুরু করেছিলেন এভাবে: "ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙালির ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরেজি অক্ষরের নাম একরকম, তাহার কাজ আর-এক রকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে u-কে বলিব ইউ, কিন্তু up- এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোনো পুরুষে ইউ নন।"

এই জায়গা থেকে আমরা ভাষিক প্রভেদ ও পরিবর্তনশীলতার দিকে ফিরে তাকাব। এ কথাও সবার জানা যে, দুই বাংলা-ভাষী প্রান্তের রাজধানীকে কেন্দ্র করে প্রায় দুই ধরনের উচ্চারণ তৈরি হয়ে গেছে বিগত ৬৭ বছরে। ১৯৮৩-তে ছাপা মনিরুজ্জামানের সঙ্গে লেখা– একাশির বাংলাদেশে করা আমাদের সর্বেক্ষণের ভিত্তিতে রচিত– *Diglossia in Bangladesh and Language Planning* (জ্ঞান ভারতী কোলকাতা, পৃ: ২১৪)। এই গ্রন্থে যার প্রতিলিপি এখন পাওয়া যায় না, কিংবা ১৯৮৬ সালে প্রবন্ধাকারে বেরোয় জশুয়া ফিশম্যানের (এবং Tabouret Keller, M. Klyne, Bh Krishnamurti ও M Abdulaziz-এর যৌথ) সম্পাদনায় 'দ্য ফার্গুসনিয়ান ইমপ্যাক্ট' বই ও IJSOL-এর বিশেষ সংখ্যায় *Contributions to the Sociology of Language*, Vol 42 রূপে, সেখানে দুটি বাংলা-ভাষী প্রান্তে সাধু-চলিতের ব্যবহারের পার্থক্যের গতি-প্রকৃতি কী এবং কেমন করে বাংলাদেশের বাংলায় সেই বড়ো বিবর্তন আসছে বলে আমাদের মনে হয়েছিল আজ থেকে ঠিক তিন দশক আগে তা নিয়ে আলোচনা আছে। বস্তুতপক্ষে এই বিষয়ে পরে চার্লস ফার্গুসন, আফিয়া দিল, আনোয়ার দিল ও আমি ইসলামাবাদে একটি আড্ডায় দীর্ঘ আলোচনাও করি। বিশেষ করে উচ্চারণের সন্দর্ভে বাংলাদেশের মানুষ সত্তর দশকের শেষেও যে 'চলিত-তা' বা প্রমিত প্রচলিত বাংলার থেকে মনে মনে দূরে ছিলেন, তা আমাদের এই সার্ভে থেকে উঠে আসা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে হয়েছে– যার কারণ হয়ত মুক্তিযুদ্ধের আগে ও ঠিক পরেও অনেক বাংলাদেশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মিশ্র শৈলী ও মিশ্র উচ্চারণে বাংলা বলার থেকে এসেছে। তখন পর্যন্ত দেখা গেছে আইনের বইয়ে, আদালতে, সরকারি বিজ্ঞাপনে ও বহু আধা-সরকারি কাজে-কর্মেও সাধু শৈলীর প্রয়োগই স্বাভাবিক, এমন ধরেই নেওয়া হতো। তখন (সত্তরের দশকে) দেখা গিয়েছিল দুই বাংলাতেই প্রমথ চৌধুরী ও পরবর্তীকালের রবীন্দ্র-রচনার প্রভাবে সাধুর সত্যিকারের ব্যবহার কমে এলেও দ্বি-শৈলিকতা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা প্রয়োগের তুলনায় বাংলাদেশের বাঙালির মনে (বা ভাষিক মনোভাবে– linguistic attitude-এ) অনেক বেশি স্থির।

সাধু ও শিষ্ট শৈলী এখনও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলার সামাজিক ব্যাকরণ (Social Grammar) লিখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে এখনও সংস্কৃতনিষ্ঠ বা তদ্ভব

মিল-অমিল নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। যেমন, কবি-বৈয়াকরণ লিখছেন: "যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠ্‌শালা' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভূষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলাভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।" এবং এর উদাহরণের খোঁজ উনি জন বীমসের বাংলা ব্যাকরণ থেকে রাজা রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ সবার গুণ-দোষ বিচার করে কখনও তাঁদের সমর্থনে কখনও বিরোধে নানান অপবাদ উপস্থাপনা করে নিজের মন্তব্য রেখেছেন। এরও একটা উদাহরণ নেওয়া যায়:

"বীম্‌স্ লিখিয়াছেন, বিশেষণ শব্দে সিলেব্‌লের অন্তরবর্তী অকারের লোপ হয় না; যথা, ভাল ছোট বড়।

রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন: গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয় যেমন ছোট খাট; এতদ্‌ভিন্ন তাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্ পট্ রাম্ রাম্‌দাস্ উত্তম্ সুন্দর ইত্যাদি।

রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপমান করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, তথাপি খাঁটি বাংলা শব্দেও ব্যতিক্রম মিলে; যথা, নরম গরম। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে।

প্রথমেই মনে হয়, বিশেষণ শব্দ বিশেষরূপে অকারান্ত উচ্চারিত হইবে, এ নিয়মের কোনো সার্থকতা নাই। অতএব, ছোট বড় ভাল প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ যে সাধারণ বাংলা শব্দের ন্যায় হসন্ত হয় নাই, তাহার কারণটা ঐ শব্দগুলির মূল সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যাইবে। 'ভালো' শব্দ ভদ্র শব্দজ, 'বড়ো' বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, 'ছোটো' ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত-যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে হসন্ত বর্ণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। নৃত্য-র অপভ্রংশ নাচ, পঙ্ক-পাঁক, অঙ্ক-আঁক, রঙ্গ-রাং, ভট্ট-ভাট, হস্ত-হাত, পঞ্চ-পাঁচ ইত্যাদি"।

৪. ধ্বনি, বলন, কথ্যতা ও লিখিততা

'ছন্দ' গ্রন্থে 'গদ্যছন্দ'-শীর্ষক নিবন্ধে আমরা দেখছি কবির তীক্ষ্ণ বক্তব্য – কথ্য ও লেখ্য ভাষার বিষয়ে। লিখছেন: "একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্যপত্তন হয় নি। যেমন কল-কারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূমি-উৎপাদন সম্ভবপর হল তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসংকোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বল, আর তাঁর ভাণ্ডারই বল প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার

উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলল, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি।" খুব স্বাভাবিক যে এখন অনেকেই লিখিত বাংলার মতন করে কথ্য ভাষায় কথা বলবেন এমন নিশ্চয় করে ফেলেছেন। তাঁদের ভাষায় অবশ্যই বই-বই গন্ধ পাওয়া যায়। যাঁরাই লাল-গান ও লাল-কথা ও লাল-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী তাঁদের কথ্য বাংলায় সাধারণ মানুষের মুখের বা উচ্চারণের ভাষা না থাকলেই নয়। কিন্তু যাঁরা সুখী, হাসি-হাসি গন্ধে ভরা, গান ভাঁজছেন নীল সুরে, তাঁদের একটা শিখে-জেনে নেওয়া কৃত্রিমতা (acquired artificiality) থাকতেই হবে। তাঁদের শ্রেণি-সদস্যতার মাশুলই হলো প্রমিত উচ্চারণের ধারায় কণ্ঠ-ধ্বনির তানপুরাকে বেঁধে রাখা। জন্ম হয়ত পাবনা কিংবা তমলুকে – কিন্তু নিজের মুলুকের ভঙ্গিতে কথা বলা বর্জন করেছেন। তাঁদের কথা বলা মানে রাশি-রাশি কথা বলা – এই অনেক কথার মধ্যে বলাটা এক রকম শোনাতে হবে।

ঠিক এমনিভাবে উচ্চগ্রামে হিন্দি কথা শুনে শুনে যখন কোনো সভায় হাঁফ ধরে যায়, তখন ব্যঙ্গ করে অনেকে এই শৈলীকে বলেন 'আকাশবাণীর হিন্দি' কিছুটা BBC English-এর মতোই। যেখানে গান, কবিতা, পাঠ, অভিনয়, কথকতা (বা উর্দুতে যাকে বলা হচ্ছে 'দাস্তানগোঈ'-এর পরম্পরা) থাকবে, সেখানে উচ্চারণেরও সর্বগ্রাহ্যতার উপর জোর থাকবেই। এই 'সর্বগ্রহণীয়' উচ্চারণের মানেই যে তার মধ্যে কোনো বন্ধ্যাত্ব থাকবেই, তা নয়। তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে উচ্চারণ-বিচিত্রা। অবশ্য এও ঠিক যে, আজকের ব্যস্ততার যুগে এই ধ্বনির জগতের বাইরে ভাষার স্থান বিষয়ের ভিড়ে ও বিষয়বস্তুর তুলনায় শুকিয়েই যাচ্ছে, কবির কথায়: "স্থানের এই অসংকোচে গদ্যের ভূরিভোজ।... বাক্যের এতবড়ো সদাব্রতের আয়োজন... শব্দের অতিব্যয়িতা।" এবার কথা হচ্ছে উচ্চারণের প্রমিত কানুনের বাইরে গিয়ে যদি আপনি কোনো আনুষ্ঠানিক স্তরে বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কথা বলা আরম্ভ করেন, তখনই এক দল নিন্দুক "গেল-গেল" রব তোলেন। সেকালের গান ও সঙ্গীতের 'বোঝাদারি' নিয়ে এই প্রসঙ্গেই উনি বলছেন: "বর্তমান সমাজে ইংরেজির রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হত যদি দেখা যেত-সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনাবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে কিংবা ওস্তাদকে রাগরাগিণী ফর্মাশের বেলায় রীত রক্ষা করে নি। তাতে যেন বংশমর্যাদায় দাগ পড়ত।" প্রমিত উচ্চারণ না হোক, শিষ্ট বাংলার গুরুত্বও কিছুটা এই রকমেরই।

আড্ডায় শোনা একটি গল্পের (বানানোও হতে পারে- এর মধ্যে চাপা হাসি লুকানো দেখে অন্তত তাই মনে হয়েছে) প্রসঙ্গ এখানে তুলতে পারি। পূর্বে উল্লিখিত উম্মে মুসলিমা-র বর্ণনাতেই পাচ্ছি এই ঘটনাটির কথা– "এক বান্ধবী বাড়ি থেকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণ শেষ করে হলে এসে বন্ধুদের কাছে তাঁর দুঃখের গল্প বলছে, 'জানিস আজ ট্রেনে আসার পথে আমি প্রায় প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম। কামরায় উঠে দেখি আমার সামনের সিটে এক অতি সুদর্শন যুবক বসে। ভাবলাম ভালোই হল, পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আর বোর

লাগবে না। দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত ভাব বিনিময় হলে হয়ে যাক। কী তার চাউনি! কী তার বসার ভঙ্গি! খবরের কাগজ থেকে কখন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাবে, তার জন্য মুখটায় যতটা সম্ভব মোহনীয় ভাব ফুটিয়ে বসে থাকলাম। বাববাহ্, কী অহংকার! পাশের জনের সঙ্গেও কথা বলে না। একবার আমার দিকে তাকাতেই দিলাম একটা ভুবনমোহিনী হাসি। সেও প্রত্যুত্তরে এমন এক হাসি দিল যে, একেবারে বুকে এসে বিঁধল। আর মাত্র দু'টো স্টেশন। সুদর্শনের মুখের একটা কথা শুনব না? কোথায় যাচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে কিনা? কোন দিন আবার দেখা হবে কিনা? লজ্জার মাথা খেয়ে ওর পাশের জনকে আগে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে নামবেন নাকি?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। আমি দ্বিধাভরে সুদর্শনকে 'আর আপনি?' বলতেই জবাবের জন্য মুখিয়ে থাকা সুদর্শন বলল–'ছামনের এস্টেশনে।' ব্যস, আমার প্রথম প্রেম প্রত্যাশা এক নিমিষে হাওয়া।' (উম্মে মুসলিমা, ২০১৪, মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বিশেষ রচনা : শুদ্ধ উচ্চারণের শিক্ষা)।"

অথচ আমার ১৯৮৬-এর সাধু-চলিত প্রসঙ্গের লেখায় আমি মুনীর চৌধুরী মশাইয়ের সেই বক্তব্য মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে উনি বিগত শতকের ষাটের দশকে এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, কয়েক দশক পরে এমন একটা সময় আসবে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে হাঁটতে হাঁটতে তরুণ-তরুণীরা নির্দ্বিধায় সদ্য-প্রমিত ঢাকা-ময়মনসিংহ কথ্য ভাষায় বা বিকল্প চলিতে প্রেম নিবেদন করতে বা প্রেমালাপ করতে দ্বিধা-বোধ করবে না। বিগত পঞ্চাশ বছরে মনে হয় এই বঙ্গে এখন এমনটাই হয়েছে। 'প্রমিত বাংলা উচ্চারণবিধি ও রীতি' (ঢাকা: সূচীপত্র) গ্রন্থে বেগম জাহান আরা (২০১২) নিজের মত বলতে গিয়ে লিখছেন: "...উচ্চারণ বিধি রীতি বিশ্লেষণের ব্যাপারে কোনো নিয়ম আরোপ করার চেয়ে প্রথমে প্রচলিত নিয়মকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা উচিত।" আর নিজের বিষয়ে উনি সেই কাজই করে দেখিয়েছেন। অবশ্য এই বিষয়ে বাংলাদেশের অনেক ভাষাবিদের নামই করা যায়– যদিও সবার কাজের সঙ্গে এবং এদেশের মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে এমন সব ভাষা-সমস্যা নিয়ে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের অনেকে পরিচিত নন। উদাহরণস্বরূপ, ঠিক যেমন বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক ও ভাষা-চিন্তকেরা মিলে সম্মিলিত প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-র জন্য 'আকাদেমি বানান অভিধান' রচনা করেন (যাঁদের মধ্যে ছিলেন: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখ ১৫ জন), এখানেও আমরা দেখছি অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের মতন সফল বাচিক-শিল্পী ও গবেষক যিনি প্রমিত বাংলা উচ্চারণের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ অধিকারী– 'বাচিক শিল্পী নরেন বিশ্বাস; প্রমিত বাংলা উচ্চারণের পথিকৃৎ', যায়-যায়-দিন, বুধবার, ডিসেম্বর, ২৫, ২০১৩) এবং 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান'সহ অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। এও দেখছি যে, কিছু কিছু NGO প্রমিত বাংলা উচ্চারণের প্রশিক্ষণও দেওয়া শুরু করেছেন– যেমন এ-বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারির একটি সংবাদ দেখছি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট-টিভি'-তে যেখানে জানানো হলো যে, গত ছয় বছর ধরে "মাদারীপুরে কোমলমতি শিশুদের শুদ্ধ রূপে বাংলাভাষার উচ্চারণ

শেখাচ্ছে 'মাত্রা' নামের একটি সামাজিক সংগঠন"।

অর্থাৎ প্রমিত উচ্চারণের একটা সামাজিক চাহিদাও তৈরি হয়েছে। আবার একদম হাল-ফিল খবরে এই ২৭শে আগস্ট দেখলাম– বিকৃত উচ্চারণ আর বিদেশি ভাষার সুরে বাংলা উচ্চারণ চলবে না এবং এজন্য "সব ধরনের ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধে তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের (সম্প্রচার) নেতৃত্বে ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাইকোর্ট ডিভিশনের চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি ও ২৯ এপ্রিলের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১২ সালের ২২ জুলাই গঠিত এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। নতুন এ কমিটি স্থায়ী কমিটি হিসেবে কাজ করবে। ২০১৪ সালের ১৪ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এবং ২৯ মে তথ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় বলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়" (http://mediakhabor.com/?p=2722)– যার কাজ হবে সরকারি ও বেসরকারি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম তথা সকল টেলিভিশন চ্যানেল ও বেতার সংবাদ, অনুষ্ঠান ও উপস্থাপনায় বাংলার সঙ্গে অহেতুক অন্য ভাষার মিশ্রণ পরিহার করা ও ভাষাকে বিকৃত না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সমন্বয় করা।

৫. অতঃকিম

অনেক শুভানুধ্যায়ী ও বাংলার বাক্-পথিকেরা সতীর্থেরা হয়ত এখানে এসে বলবেন- অতএব- কি করা দরকার এবং কোন পথে হাঁটব আমরা? আমার মনে হয় বিশেষ কাল-ব্যয় না করে কয়েকটি সোজা-সাপটা পরামর্শ (এই আলোচনা বা বিমর্শে 'পরামর্শ' কথাটির মধ্যে অবশ্য কেমন 'পর'-'পর' গন্ধ আছে, যেন বাইরের অন্য সমষ্টি বা গোষ্ঠীর মানুষ কিছু হিতোপদেশ দিচ্ছে) অথবা পদক্ষেপ-বিন্দু (অ্যাকশন পয়েন্ট) উল্লেখ করে সরাসরি আলোচনা বা মত-বিনিময়-পর্বে চলে যাওয়া উচিত।

১. ভাষায় বাগ-বিবিধতা চিরকালই ছিল, আর চিরদিন থাকবেও। এই বৈচিত্র্য বাংলার গর্ব, বাংলার বিভিন্ন উপভাষা ও শৈলী বাংলার ঘাড়ে কোনো চাপানো বোঝা নয় যে তাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমরা যারা ভাষার এই বহমান বিচিত্র স্রোতকে বুঝি তাদের উদ্যোগ নিয়ে আপামর (এখানে অবশ্য কেউ 'পামর' নন– সেটাই বোঝানো দরকার) জনগণকে যুক্ত করে সব কটি খবরের কাগজ, সব সরকারি ও বেসরকারি রেডিও (-চ্যানেল সমেত), টেলিভিশন এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলে বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে 'বাংলা-বিচিত্রা দিবস'-রূপে উদ্‌যাপন করা উচিত, যেদিন বাংলার বিভিন্ন উপভাষায় গল্প- কবিতা- আলোচনা- বাচিকতা- প্রতিযোগিতা- হাস্যপরিহাস- লোকগীতি-নাটক এবং আরো বেশ কিছু নতুন ধরনের লেখা-বলা-গাওয়া-মঞ্চায়ন এসব করা দরকার– এই বোধ সবার মধ্যে গ্রথিত করার জন্য যে, আমরা নানাবিধ বাংলা বলি বটে– তবে মালদা থেকে রাঙ্গামাটি অবধি আমরা সবাই

বিদ্যাপতির কথায় 'দেসিল বয়না'-তেই কথা বলি এবং এজন্য কোনো হীনমন্যতায় ভোগার প্রশ্নই ওঠে না। আজ যদি রাজনৈতিক সীমারেখাকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতিগতভাবে আমরা আমাদের নিজেদের মাটির মানুষ-জন ও তাঁদের রঙিন বাগধনু-কে সম্মান জানাতে পারি, আমার বিশ্বাস এতে আমাদের পারস্পরিক যোগসূত্র আরো দৃঢ় হবে। অনেক নতুন সুর, নতুন ছন্দ, নতুন অভিনয় উঠে আসবে জাতীয় স্তরে।

২. বাংলা ভাষার ব্যবহারের কর্পোরা যাঁরা তৈরি করেন ও করে থাকেন তাঁরা জানবেন যে, মোটামুটি সত্তর থেকে নব্বই-টি প্রয়োগ-ক্ষেত্র বা ডোমেইন আছে এবং তার মধ্যে এমন বহু প্রয়োগ রয়েছে যেখানে একরূপতার কোনো স্থান নেই– রেডিওতে যেখানে আঞ্চলিক স্টেশনে চাষ-বাসের কথা হচ্ছে, বা টিভি-তে যখন সমবায় বা গ্রামীণস্তরে বা ব্যাংক-এ বিনিয়োগের বিষয়ে কঠিন কথা সহজ করে বলা দরকার হচ্ছে, তখন প্রমিত উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং সেই সব সময়ে যে কথ্য-শৈলী প্রয়োগ করা হবে, তাতে স্থানীয় শব্দ ও বাগ্‌ধারা আর তারই সঙ্গে আঞ্চলিক টান না থাকলে জমবে না; হয়ত এমন একজন সঞ্চালক বা উপস্থাপকের দরকার হবে যিনি স্থানীয় ও প্রমিত– দুটি উচ্চারণ-শৈলীতেই কথা বলতে পারবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক কথ্য প্রসঙ্গ এমনও আসবে বা আসতে পারে যখন বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে একটা নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষ শৈলীতে কাউকে কথা বলতে হতে পারে। একই মানুষ যেমন একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারে অবলীলাক্রমে তেমনি সে যে একাধিক উচ্চারণ পদ্ধতিতে কথা বলবে প্রয়োজন বোধে তাতে আর আশ্চর্য কী?

৩. সেক্ষেত্রে এ কথা স্পষ্ট যে, যাঁরা সর্বত্র বা সর্বক্ষণ চতুর্দিকে প্রমিত বাংলাতে কথা বলছেন বা শুনছেন না তাঁদের প্রমিত উচ্চারণ শিক্ষার একটা ব্যবস্থা বা বিধান থাকতেই হবে। যদি এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলার মতন মানুষ অনেক পাওয়া যায়, তাহলে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও আদর্শ উচ্চারণে কথা কওয়া শিখতে চান, এমন মানুষজনকে শিক্ষাদানের একটা প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়াও অন্য উপায় রাখতে হবে। শুধুমাত্র NGO গোষ্ঠীর মতন নয় বা তাদের মদতে শেখানো নয়, ব্যবস্থা থাকবে নির্দিষ্ট সময় সারণি বেঁধে রেডিওতে, স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে টেলিভিশনে, মুক্ত ও দূরস্থ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অথবা বাংলা একাডেমি কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রমিত উচ্চারণ শেখানোর, বিভিন্ন মডিউলের সাহায্যে। এ কাজ ব্যয়সাপেক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ধীরে ধীরে স্কুল-কলেজের মাতৃভাষার শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বাংলা উচ্চারণ, বানান বিধি ও ব্যাকরণের উপর জোর দেওয়া দরকার, ঠিক যেমন বাংলা সাহিত্যের পাঠ নিতে হয়। কিন্তু সেখানে সমস্যা হয়েছে ভাষা-শিক্ষক বা সাহিত্য-শিক্ষকদের নিজস্ব মাতৃ-শৈলীর প্রভাব কাটিয়ে উঠে কি করে তাঁরা নবতম শৈলী ও বাগ্‌ধারায় সচেতনভাবে প্রমিত বাংলায় 'শিফট' করবেন, তাই নিয়ে জাতীয় স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অধ্যাপকদের প্রশিক্ষিত করার দায়িত্ব কোন সংস্থাকে দেওয়া হবে– তাও ভাববার বিষয়।

৫. কিন্তু যে-কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম তাতেই আবার ফিরে আসছি– ভাষা যেহেতু বহতা নদী-জল-ধারার মতন, প্রমিত বাংলা (শুধু প্রমিত উচ্চারণের কথা বলছি না) যাঁদের মাতৃ-শৈলী এমন মানুষ যদি ভারতের বাংলাভাষী অঞ্চলে বেশি থাকেন, যাঁরা এই শিষ্ট-চলিত শৈলীকে ধরে রেখেছেন এবং যাঁরা এই শৈলীতে ভাবেন, জাগেন, ঘুমান ও স্বপ্ন দেখেন, এমন কিছু মানুষকে মাস্টার-ট্রেনার হিসেবে নিতে হবে– যাতে ইতিমধ্যে ঘটতে থাকা পরিবর্তনগুলিকেও জেনে-বুঝে নেওয়া সম্ভব।

বাংলাভাষা-পরিচয়-এর প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান-প্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতিকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।" অতএব যে-কথা সব শেষে বলতে চাই যে দু-দেশের সরকারের তরফেও একটা বড়ো কাজ করার আছে। "মিলনের ও আদান-প্রদানের" সুযোগ করে দেওয়া যাতে সহজেই দুই দেশের টেলিভিশন পরস্পরের জন্য উন্মুক্ত করা, সহজ ও সস্তার ডাক-তারের ও ফোনের ব্যবস্থা করা, সহজেই ছায়াছবির আদান-প্রদানের কথা। এমনটা হলেও "কানে শোনার" একটা জোয়ার আসবে। আর তা এলেই প্রমিত উচ্চারণ বাংলাভাষী মানুষের জিহ্বায় গেঁথে যাবে। এই ধ্বনি ও তার বিবিধতা-বৈচিত্র্য, এসবই জানা মানুষের মূলভূত ভাষিক অধিকার।

'আকাশপ্রদীপ'-এ 'ধ্বনি' বলে একটি কবিতা আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বালক কীভাবে ধ্বনি আহরণ করছে–

"জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন দিয়া,
চারি দিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।"

বলাই বাহুল্য– বালক ধ্বনি আর উচ্চারণ আহরণ করেছে প্রকৃতি থেকে– তাতে সে "নির্জন দুপুরে, চিলের সুতীক্ষ্ণ সুর" শুনছে, "ওপাড়ার কুকুরের সুদূর কলকোলাহল" সে টের পাচ্ছে, শুনছে সূক্ষ্ম "ফেরিওলাদের ডাক," "রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ঊর্ধ্বস্বরে-ডাক", এদিকে "দিত সে ঘোষণা কোনো অস্পষ্ট বার্তা"-র।

এভাবেই বুলি-বা-বাণী শিখতে পারবে মানুষ।

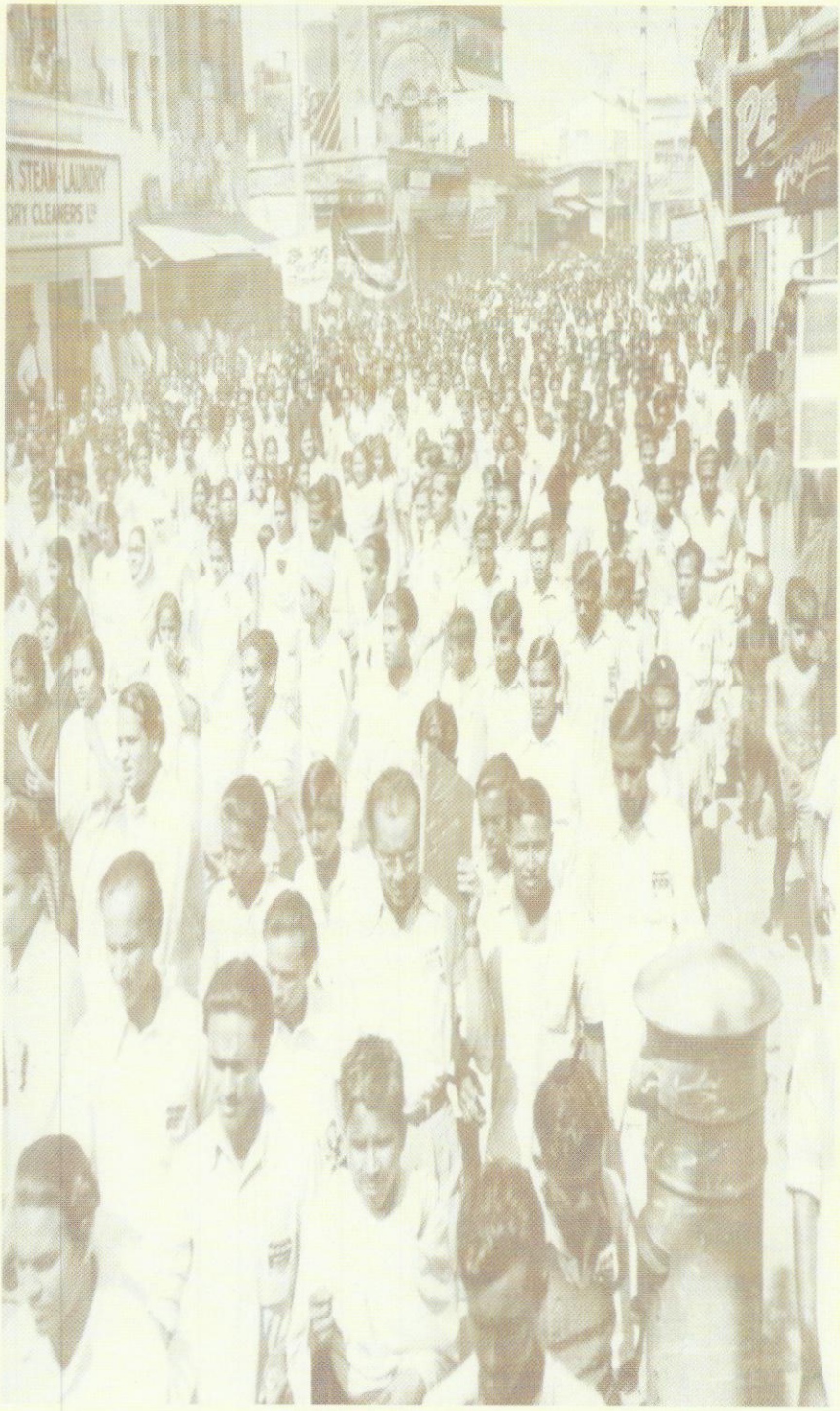
A STEAM LAUNDRY
DRY CLEANERS LTD

বাংলা ভাষার রক্তরঞ্জিত ইতিহাস

মোনায়েম সরকার*

ভাষার উৎপত্তি কেমন করে হলো তার কোনো সঠিক ইতিহাস নেই। যে যেভাবে পেরেছে সে সেভাবেই একটা যৌক্তিক অনুমানের ভিত্তি থেকে ভাষার উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলো দাবি করে ভাষার সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর। কথাটা এক অর্থে সত্য হলেও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণে এ কথা খুব একটা খাটে না। বরং ভাষা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মাধ্যমে এই মতের পক্ষেই ভাষাবিদদের জোর সমর্থন মেলে।

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, যেই মানুষের কোনো ভাষা নেই বা ভাষা ব্যবহার করে না। আধুনিককালের ভাষা বিজ্ঞানীরা বলার চেষ্টা করেছেন, যে মূলভাষা থেকে পৃথিবীর ভাষাগুলো সৃষ্টি হয়েছে তার নাম 'ইন্দো-ইউরোপীয়' মূলভাষা। খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বে মধ্য-এশিয়ায় একদল লোক বসবাস করত। এই লোকগুলো প্রথম যে ভাষা ব্যবহার করত সেই ভাষাই 'ইন্দো-ইউরোপীয়' মূলভাষা। এই মূলভাষা থেকেই বিভিন্ন বাঁক পেরিয়ে জন্ম নিয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা– 'বাংলা'।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৬ হাজারের মতো ভাষা আছে। এই ছয় হাজার ভাষার মধ্যে এমন ভাষা আছে প্রায় পঞ্চাশের অধিক যে ভাষায় মাত্র একজন লোক কথা বলে। কোনো কোনো ভাষায় কথা বলে মাত্র ১০০ জন মানুষ। প্রায় দেড় হাজার ভাষা এখন চালু আছে– যে দেড় হাজার ভাষায় কথা বলে ১,০০০ জনেরও কম মানুষ। বর্তমান পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান সপ্তম। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, যে ভাষায় ৩০ কোটি মানুষ তাদের ভাব বিনিময় করে সেই ভাষাকেই একদিন হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তার চেয়েও বড় ব্যাপার হলো– যেই বাংলা ভাষাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, সেই বাংলা ভাষা তো বেঁচে রইলই, পর্যায়ক্রমে ভাষা আন্দোলন একটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিল এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার গৌরব অর্জন করল।

বাংলা ভাষার আন্দোলন দুই পর্যায়ে হয়েছিল। প্রথমে ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একবছর পর। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন

*লেখক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিকর্মী

শুরু হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে, তারা ভাষার জন্য জীবন দিতেও পিছপা হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে অত বড় আন্দোলন বাঙালি জাতি ছাড়া আর কোনো জাতি করেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটনের প্রস্তাবিত ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রকাশ করা হলে ঠিক তার অব্যবহিত পরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মদ দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সেকেন্দ্রবাদ শহরে আয়োজিত এক উর্দু সম্মেলনে এই মর্মে ভাষণ দেন যে, প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে 'একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা'। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে লিখিত প্রতিবাদ পেশ করেন ভাষাবিদ ও জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই নিবন্ধের শিরোনাম ছিল– 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'। এই নিবন্ধেই প্রথম বলা হয়– বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এরপরে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যখন করাচিতে গণপরিষদে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' মর্মে প্রস্তাব পাশ করা হয় তখন কুমিল্লার অকুতোভয় রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সোচ্চার কণ্ঠে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার ইতিহাসে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম অমর হয়ে থাকবে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে এদেশের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। পাকিস্তানি জুলুমবাজ সরকার রাষ্ট্র ভাষার এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য নির্বিচারে গুলি চালায় নিরীহ বাঙালি জাতির উপর। বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে যায়। শহিদ হয় আবুল বরকত, জব্বার, রফিক উদ্দিন, সালাম ও আরো কয়েকজন, আহত হয় প্রায় শতাধিক ভাষাসৈনিক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মুহূর্তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চাকরিরত ছিলেন ইংরেজ চিকিৎসক এলিংসন। এলিংসন সেদিন আহত ভাষাযোদ্ধাদের যেভাবে পরম যত্নে অপারেশন করেছেন তা চিরদিন বাঙালি জাতির মনে থাকবে। কেউ কেউ মনে করেন ডাক্তার এলিংসন না থাকলে সেদিন নিহতের সংখ্যা আরো বেড়ে যেত।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর ঢাকা নগরী এক ভয়াল রূপ ধারণ করে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্ররা মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা শুরু করে এবং ছাত্রদের সমর্থনে মহল্লার অধিবাসীরা দলে দলে এগিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি অফিস-আদালত থেকে শুরু করে দোকানপাট-যানবাহন চলাচল সব কিছুই বন্ধ হয়ে যায়। স্রোতের মতো মানুষ এগিয়ে আসে হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে আগত সব মানুষের মুখে তখন শোকের কালো ছায়া, সবার চোখেই ক্রোধের আগুন।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে যাঁরা শহিদ হয়েছিল তাঁদের লাশ রাখা হয়েছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। কথা ছিল এই লাশ নিয়ে পরদিন শোক মিছিল বের করা হবে। কিন্তু রাত আনুমানিক দুই-আড়াইটার সময় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী একদল পাঞ্জাবি সৈন্যের সাহায্যে হাসপাতাল ঘেরাও করে। শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা জোর করেই হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশগুলো নিয়ে যায়। তখন কারফিউ চলছিল। সেই কারফিউয়ের মধ্যেই দুইজন ছাত্র সৈন্যদের পিছু নেয়। শুধু তাই নয়, সৈন্যরা লাশগুলো আজিমপুর কবরস্থানে কবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর এই দুইজন ছাত্রই ভাষা শহিদদের কবর শনাক্ত করে আসে। সেদিন যদি ওই দুই ছাত্র ভাষা শহিদদের কবর শনাক্ত করে না আসত আজ আমরা প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের কবরে শ্রদ্ধা জানাতে পারতাম কি-না, কে জানে!

২১ ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণের খবর শুনে সেদিন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন তিনি হচ্ছেন তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ববাংলার প্রথম উপ-নির্বাচনে (টাঙ্গাইল) বিজয়ী নেতা জনাব শামছুল হক। একদিকে শামছুল হক সাহেব হতাহত ছাত্র-জনতাকে দেখতে হাসপাতালে যান, অন্যদিকে সশস্ত্র পাহারায় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ঢাকা বেতার থেকে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় লড়াকু ছাত্র সমাজকে তিরস্কার করেন। নূরুল আমিনের বক্তৃতা থেকেই মুসলিম লীগের ফ্যাসিস্ট চেহারা বাঙালির কাছে ধরা পড়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পর পাকিস্তানি সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সরকার বাংলাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

১৯৬৪ সালে আমরা 'পূর্বপাকিস্তান বাংলা প্রচলন সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। ড. মাহফুজুল বারী– সভাপতি, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী– কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক– ফকির আশরাফের অনুপস্থিতিতে আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। আমরা 'মাতৃভাষা' নামে একটি সংকলন বের করি এবং একটা পোস্টার ছাপিয়ে বিলি করি, যার বক্তব্য ছিল– 'বাংলা বলুন, বাংলা লিখুন, অন্যকেও বাংলা বলতে সাহায্য করুন, অন্যতর রাষ্ট্রভাষা বাংলার পূর্ণ মর্যাদা দিন, শহীদের রক্তদান সার্থক করে তুলুন।' আমরাই প্রথম শুধু বাংলা বইয়ের মেলা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। বঙ্গবন্ধুই প্রথম ১৯৭০ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১মিনিটে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের রেওয়াজ প্রচলন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর আমরা খালি পায়ে প্রভাত-ফেরি করি ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১মিনিট থেকে পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা পর্যন্ত, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' অমর একুশের গান গেয়ে। যার রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। আজ এ অমর একুশের গান গাওয়া হয় ১৮৮ দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)-র সাধারণ পরিষদ তার ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের সমর্থনে

সর্বসম্মতভাবে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইউনেস্কোর প্রস্তাবে বলা হয়: '১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্যে বাংলাদেশের অনন্য ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং ১৯৫২ সালের এই দিনের শহিদদের স্মৃতিকে সারাবিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কোর ১৮৮টি সদস্য দেশ এবং ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে।' ইউনেস্কোর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী প্রথম পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।'

একটি বিষয় লক্ষণীয়, ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কারাগারে বন্দি এবং ভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলেই একুশে ফেব্রুয়ারি লাভ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অসামান্য গৌরব। শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার এই কৃতিত্ব বাঙালি জাতি কোনোদিনই ভুলতে পারবে না।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বাঙালি জাতি মৃত্যুর ভয়কে জয় করে ফেলে। ভাষা আন্দোলনের সাহস থেকে বাঙালি জাতি সোচ্চার হয়ে ওঠে জঙ্গি পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধে জয় লাভ করে সাহসী বাঙালিরা। বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তাই মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ইতিহাসও বটে।

জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা

বেগম আকতার কামাল*

সংস্কৃতি কখনো একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। আদিকালে মানুষ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ, জমাট অনুভূতিতে আছন্ন। তাদের চেতনা ছিল এককের অভিন্ন মাত্রায় বিন্দুবদ্ধ। ক্রমে তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল বৈচিত্র্যের ধরনটিকেও। তারা বুঝতে পেরেছিল নর-নারীর পার্থক্য, সংখ্যার তাৎপর্য– এক-দুই-তিন-চারের ভিন্নতা, গোলাকৃতি-লম্বার তারতম্য, বর্গাকার কী ইত্যাদি। এসব পার্থক্যকে তারা বুঝে নিত জীবীয় একমাত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, আরো গভীর কিছু অলৌকিক তাৎপর্য হিসেবে। মানুষ যেমন তার সামগ্রিক অনুভূতিতে নিজের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে সমষ্টির সঙ্গে অভিন্ন মাত্রায় বাঁধতে পারে, তেমনি সে ধীরে ধীরে এও বুঝতে শেখে যে, অন্তর্লীন বিভেদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ফলে ওই একক অভিন্ন ধারণাকেই বিভেদের মাত্রায় বিচিত্র করে তোলে। যেমন, 'দেবতা' প্রতীকটির কথা ভাবা যেতে পারে। শব্দটি একমাত্রিক, কিন্তু স্থান, শ্রেণি ও গোষ্ঠীভেদে এর নানা আবির্ভাবেই জন্ম নেয় বহু সংস্কৃতির পরিধি– কোথাও তা নারী–দেবী, কোথাও নর–দেবতা, কোথাও বা অর্ধনারীশ্বর। কোথাও মূর্ত, কোথাও বিমূর্ত। অর্থাৎ বিশ্বের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা, নর-নারীর প্রতীকার্থ, নরাশ্রিত প্রজনন ইত্যাদি জৈবিক একমাত্রিকতা থেকেই সংস্কৃতির বহু ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। সংস্কৃতিতত্ত্বের প্রসঙ্গে এইসব জৈবিক একমাত্রিকতা সূত্রটির কালপ্রবাহে নানা রকম ভাঙচুর যেমন ঘটেছে তেমনি সেই Antique era– প্রাচীনযুগের একমাত্রিকতার কঠিন আবদ্ধ নির্মিতি ভেঙ্গে পড়ার বিপর্যয়ও লক্ষণীয়। আর সভ্যতা গতির সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতির জগৎ আরো অন্তর্জটিল হয়ে ওঠার ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়।

সংস্কৃতির ব্যাখ্যা হতে পারে পুরাণতত্ত্বের আলোকে, নৃতত্ত্বের সূত্রে, দর্শনের দৃষ্টিকোণে, আর্থসমাজতত্ত্বের আওতায়, সর্বোপরি নন্দনতত্ত্বের মাত্রায়। তবে একটি কথা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি গোষ্ঠী-শ্রেণি-রাষ্ট্র-বিশ্বায়ন ইত্যাদি বলয়ের মধ্যে বিবর্তিত হলেও তা সর্বদাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই সংস্কৃতির কিছু চিরায়ত উপাদানকে দার্শনিকেরা চিহ্নিত করেন এই ব্যক্তিবাদী-অর্থেই। তাঁদের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ, সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ ও মাত্রাচেতনা (আবদুল মতিন, ১৯৮৫)। 'মৌল সংস্কৃতির' অর্থ সন্ধানে দৃষ্টিপাত করতে হয় পরিমার্জিত মানুষের মূল্যচেতনার নৈতিকতার কেন্দ্রীয় অবস্থানের দিকে। এই

*চেয়ারপার্সন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নৈতিকতাকে ঘিরেই মানুষের যথার্থ যে সংস্কৃতি– আচরণ, অভিরুচি, ভাষাভঙ্গি, পোশাক-আশাক, সৌন্দর্যপ্রীতি ইত্যাদি সেটাই মৌল সংস্কৃতি।

তবে এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণের বাইরে রয়ে গেছে সংস্কৃতির বিরাট ইতিহাস, যা সভ্যতার বর্বরতারও দলিল বটে। এটি যেমন বৌদ্ধিকতার বিষয় তেমনি রাজনৈতিক ইতিহাসেরও পরিধিতে যুক্ত। সংস্কৃতিতত্ত্ব তাই রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ভাবাদর্শগত মূল্যবোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এবং তত্ত্বটি এক নয়,– অনেক, আর সেসব তত্ত্বও তৈরি হয় রাজনীতি-ভাবাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতায়। অন্তত বিশ শতকের সংস্কৃতিতত্ত্বে আমরা এসবই দেখি। আর একুশ শতকের শূন্য দশকের পরে প্রথম দশকে এসে আমরা দেখি যে, ঐ পরিপ্রেক্ষিতলব্ধ তত্ত্বগুলো কীভাবে জড়িয়ে আছে জাতীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রবাদের সঙ্গে। আরো জড়িয়ে আছে প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সংঘর্ষের সঙ্গে, বিশ্বায়নের সঙ্গে।

সংস্কৃতি ব্যক্তির মানস বৈশিষ্ট্য হলেও তা শ্রেণি-জাতিভিত্তিক। অথচ একটি রাষ্ট্রে যেমন ব্যক্তির সংস্কৃতি আছে, তেমনি আছে নানা জাতিক সংস্কৃতিও। আধুনিকতা জন্ম দিয়েছে যে রাষ্ট্রবাদী-জাতীয়তাবাদ তা এইসব বহুজাতিক সংস্কৃতির জটিল পরিধিকে ধারণ করা-না করার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে যুযুধ্যমান অবস্থায় আছে। সংস্কৃতিমান ব্যক্তি আর বাঙালি সংস্কৃতি বা গারো বা চাকমা সংস্কৃতি কিংবা হিন্দু সংস্কৃতি– ইত্যাকার নামাঙ্কিত সংস্কৃতি তাই দ্বিমুখী বৈপরীত্যে অবস্থান করে। একদিকে রাষ্ট্র চায় সংস্কৃতির অবিভাজ্য রূপ, যেন একটি সংস্কৃতির ছায়াতলে সকল নাগরিক ঐক্যবদ্ধ নয়, অন্যদিকে গোষ্ঠীগুলি চায় স্ব-স্ব সংস্কৃতি ধর্ম বহাল থাকুক, এক্ষেত্রে আরেকটি সঙ্কট ছায়া বিস্তার করে। সেটি হলো প্রযুক্তির বিকাশ, যন্ত্রসভ্যতার অপ্রতিহত গতি। প্রযুক্তি ক্রমাগতই পরিবর্তিত ও উন্নততর হতে থাকে বলে তা স্থিরতর সংস্কৃতিকে– যা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে ঐতিহ্যের অন্তর্গত, তাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। তখনই দেখা দেয় সংস্কৃতির সঙ্কট। আসলে মানুষের জীবন-যাপন ও চেতনার বহির্ভাগে প্রযুক্তির বিচিত্র আবিষ্কারগুলি যতটা দ্রুত কাজ করে, অন্তর্তলে ততটা করে না। সেখানে বিশাল একটি অঞ্চল থাকে আবহমান সংস্কৃতির বর্ণে রঞ্জিত। এই সংস্কৃতিই মানুষকে প্রেরণায়িত করে, তার সাংস্কৃতিক অর্জনগুলিকে অভিষিক্ত করে সৃজনবৃত্তির সঙ্গে। এবং এই সৃজনশীল প্রেরণাস্নাত অনুভূতিই ব্যক্তির প্রাইভেট সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চায় প্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্রসবর্স্বতা থেকে। যেমন, টেলিভিশন বা কম্পিউটার এসময়ের সর্বাধিক ব্যবহৃত ও আবশ্যকীয় প্রযুক্তি; তা হয়ে উঠেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের উপকরণ, এমনকি সংস্কৃতিরও অঙ্গ। এবং এই প্রযুক্তি শুষে নিচ্ছে ঐতিহ্যকে, মুহূর্মুহূ বদলে দিচ্ছে সংস্কৃতির ভাবাদর্শ।

বিশেষত, স্যাটেলাইট কালচার সাহিত্যকে লীন করে দিচ্ছে সিরিয়ালের আঙ্গিকে। এতে বোঝা যায় সংস্কৃতির উপরে প্রযুক্তির প্রবল আধিপত্য স্থাপিত হচ্ছে আর ক্ষমতাগত অর্থে তৈরি হচ্ছে প্রযুক্তিগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ প্রযুক্তি সংস্কৃতির বিপর্যয় ও জন্ম– দুটোই ঘটাচ্ছে। তবে তার নেপথ্যে কাজ করছে রাষ্ট্রবাদ ও বিশ্বায়নের টানাপোড়েন।

প্রাচীন বিশ্বে যে গোষ্ঠীবাদ বা কৌমতন্ত্র লক্ষযোগ্য ছিল এবং তা থেকে উৎপাদিত সংস্কৃতি– যাকে আমরা বলেছি একমাত্রিকতা তা ভেঙে গিয়েছিল প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির জন্যেই শুধু নয়– মানবপ্রজাতির স্বভাবে অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য ও বিভেদের কারণেও। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ ও তার রাষ্ট্রবাদ যেভাবে সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণিকে একমাত্রিকতায় বেঁধে দিতে চায় তা কি সংস্কৃতির ঐ বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতাকে চাপা দেয়? এ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে আছে রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্ষমতায়নের রাজনীতি। বহুধাবিচ্ছিন্ন উপাদান নিয়েও আধুনিক জাতি ও রাষ্ট্রবাদ একটি স্মারক-স্মৃতি-কৃত্যের মধ্যে সংস্কৃতিকে বেঁধে দেয়। কৌমতন্ত্রে যে প্রতীক বা কৃত-আচার-অনুষ্ঠান ব্যক্তিকে একমাত্রিক সংস্কৃতিকে আবদ্ধ করে রাখত, আধুনিক জাতি ও রাষ্ট্রবাদ ওই একই কাজ করছে। এই একমাত্রিকতাই রাষ্ট্রের টিকে থাকার ভিত্তি। জাতিবাদী রাষ্ট্র যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে– যা আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ ফসল তারও একক একটি স্মারক বা কৃত্য খুঁজতে হয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে। যেমন, বাঙালিজাতির সংস্কৃতি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অবতলিক ভিত্তিভূমি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে অন্যান্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব কি লীন হয়ে যাবে বাঙালিত্বের মধ্যে? এতে কি চাপা পড়ে যায় না সংস্কৃতির মিশ্ররূপ, বাধাগ্রস্ত হয় না কি সংস্কৃতিমান ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতা? এক্ষেত্রেই আমরা ভাষার প্রয়োজনীয়তার দিকটি খুঁজে নিতে পারি।

ভাষাই বাস্তবতা। ভাষাই নামকরণ করে তৈরি করে দেয় বাস্তবতাকে। বর্তমান বিশ্বে ভাষার দর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ইতিহাস-ধর্ম-রাজনীতি-দর্শন-সাহিত্য– সবকিছুকে। বাঙালিজাতি ইতিহাসের নিয়মেই ভাষা আন্দোলন ও আত্মদান করেছিল। '৭১-এর ফলে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা-ও ভাষার নামেই। বাংলা ভাষা শুধু সমৃদ্ধ, শক্তিশালী একটি ভাষাই নয়, শুধু দুই বাংলায় বাঙালির বসবাসই নয়, পৃথিবীর দেশে-দেশে বহু বাঙালি তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষাকে বুকের মধ্যে নিয়ে অভিবাসী হয়েছে। আমরা যে রাষ্ট্র গড়েছি তারও ভিত্তিতে ছিল দেশজ চেতনা ও জাতির স্মারক রক্ষার চিন্তাচেতনা। এবং তা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সূত্রে নয়, দেশমৃত্তিকা ও লোকায়ত জীবন ধারার থেকে উৎসারিত সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের গর্ভ থেকে সঞ্জাত। আর তা যতটা না প্রযুক্তির অধীন, তারও অনেক বেশিমাত্রায় কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির অধীন। বাংলা ভাষাটাই কৃষিসংস্কৃতির লালন-পালনে ও সম্পর্কায়নের মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে। আমাদের চিন্তাচেতনার প্রণালী, ভাবুকতা, নান্দনিকতা ও দার্শনিকতা– সবই বাংলা ভাষার রীতি-গতি ও প্রকৃতির রূপ-বর্ণে বিগঠিত। এবং তাতে মিশে আছে দেশমৃত্তিকার সোঁদাগন্ধ, সবুজ শ্যামলাভার লাবণ্য। এই কৃষিসংস্কৃতি থেকে খুব বেশি তফাতে নেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলি। তারাও কৃষ্টি ও কৃষ্টির বিচিত্র ধারাই এক একটি উপাঙ্গ হয়ে সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে দিচ্ছে। আমরা যদি শহুরে আধুনিক যান্ত্রিক নগর সভ্যতার দিকে তাকাই সেখানেও দেখব দেশমৃত্তিকার সংস্কৃতি-স্মারক রক্ষার প্রয়াস। আমাদের পূর্বসূরি যেসব লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকেরা আধুনিক সাহিত্য গড়ে দিয়ে গেছেন– যেখানে অনেকে খুঁজে পান পাশ্চাত্যের অনুরূপতা, কিন্তু গভীর মনোযোগে দেখলে ও বিচার করলে দেখা যাবে

ঐ বৌদ্ধিক-সৃজনশীল শ্রেণির হাতে দেশজতারই মডেল তৈরি হয়েছে। সে মডেলে মাটি-নিসর্গ-ইতিহাস বর্ণময় হলেও তাতে জনসমাজের সৃষ্টিশীল চেতনা, কল্পনাশক্তি ও সংস্কৃতি-চেতনাকে ধারণের আকুলতা ছিল কম। তবু সার্বিক অর্থে বৌদ্ধিক সমাজ জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। তারা নবায়নের আবেগে ও বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে ছিলেন উদ্দীপ্ত, ছিলেন সামূহিক নির্জ্ঞান ও স্মৃতির পরম্পরায় যুক্ত ও তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় সতৃষ্ণ। এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে। আর লোকায়ত গ্রামীণ সংস্কৃতি আর জীবনের প্রধান রূপকার জসীমউদ্‌দীন তো ছিলেনই। এঁদের বৌদ্ধিক-নান্দনিক-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে যখন তারা দেশজতাকে আবিষ্কার ও রূপায়ণ করেছেন ভাষার অন্তর্বুননে। সঙ্গে-সঙ্গে দেশজ চিন্তা ও সংস্কৃতির প্যাটার্নও তাঁরা তৈরি করেছেন। এই প্যাটার্নই এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো নিয়েই আমরা সৃষ্টি করেছি ও করছি বস্তুর উপমালোক, স্থান-কালের পরিসর ও ভাষার শক্তিমত্তা। তবে এখানে একটি সঙ্কটও আছে। সেটি হলো, আমাদের মানস-সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী আধুনিকতার রাষ্ট্রবাদী সংস্কৃতি খুব একটা খাপ খায়নি– হয়ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি বলে, নয়ত যথাযথ চিত্তোৎকর্ষের অভাবে। একদিকে তা ভর করেছে আত্মজগতে আর আত্মজগতে এসেছে কখনো প্রকৃতি, কখনো প্রেম-নারী-ঈশ্বর ইতিহাসের প্যারাডাইম, আজকের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি চেতনা যেমন আবার গভীর তাৎপর্য ফিরে পাচ্ছে তেমনি প্রেম ও মানবিকতার উন্নয়নে হয়ে উঠেছে অন্যতম শক্তি। আমাদের লোকায়ত সমন্বয়বাদী ধর্মগুলির ঈশ্বরবন্দনাও এই প্রেমেরই আবেদনে মুখরিত। কিন্তু নগরসংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধনটা প্রগাঢ় হয়নি ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার দীর্ঘ সময়ের ফলাফল হিসেবে। তাই দুইয়ের মধ্যে একটি শূন্য স্থান আছে, আর সেই শূন্যস্থান দিয়ে আজকের বিশ্বায়ন অনুপ্রবেশ করছে সর্পিল ভঙ্গিতে তার নানা ইজম-তত্ত্ব নিয়ে। বিশ্বায়ন উক্ত মানস-সংস্কৃতি ও ভাষার উন্নত স্তরটি– যা তৈরি করেছিলেন উল্লিখিত মনীষীরা, ভেদ করে বন্যার তোড়ে মনে ঢুকছে বিপুল পণ্যসম্ভার ও তজ্জাত ইন্দ্রিয়ভোগ্য সংস্কৃতির পশরা নিয়ে। এসব পণ্য-প্রযুক্তির জ্ঞান ও তৈরির পদ্ধতি কোনোটাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ও জাতীয় স্মারক থেকে উৎপাদিত হয়নি; আমাদের সংস্কার চেতনায় এসবের করণ-কাঠামো অনুপস্থিত। অথচ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, বৌদ্ধিক ভাবনাচিন্তায় এসবের ছাপ পড়ছে প্রতিমুহূর্তে এবং তৈরি হয়ে চলেছে সংস্কৃতির আরেক রকম আলপনা বৃত্ত।

আমরা যদি জাতীয় সংস্কৃতির স্মারকগুলির দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব এই পরিবর্তন প্রবল শুধু নয়, কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচকও। পোশাক, খাবার-দাবার তৈরি ও পরিবেশনে আচার অনুষ্ঠানে– যা কিছু সমবেত কৃত্য, সেসবেই পণ্যবস্তুর চাকচিক্য, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। এর কারণ যতটা না সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিধি বাড়ানোর স্বতঃস্ফূর্ততা তারও বেশি রাজনৈতিক ও আদর্শিক– যে আদর্শ আমাদের জাতীয় চেতনার বিরুদ্ধে যায়। সংস্কৃতির স্মারক বাঁচিয়ে রাখার যে চেতনা তা বিশ্বায়নের বন্যায় ভেসে যাওয়ার উপক্রম, প্রযুক্তি পণ্যসর্বস্ব সংস্কৃতি বদলে দিচ্ছে আমাদের সংসারযাত্রা, রুচিবোধ, পাল্টে দিচ্ছে

দৃষ্টিকোণ, মানবীয় সম্পর্ক, চিন্তাচেতনার ধরন। যা কিছু জাতিগত অর্থে মৌলিকতা ও আত্ম-অভিজ্ঞানের স্মারক, যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্কের রহস্য-মধুরতা সবই তছনছ করা হচ্ছে। বস্তুত, এই বাস্তবতা পুরোপুরি অবাধ বাজারি প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপটে দাঁড়িয়ে আছে বলে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ কেবল অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে না, আমরা একটা সিনথেটিক সংস্কৃতিও তৈরি করছি। যেমন, পর্দাপ্রথার সঙ্গেই থাকছে বিউটি পারলার। মানসিকভাবে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা পোষণ করেও প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। বস্তুত, এই সিনথেটিক সংস্কৃতির কারণ আমাদের আদর্শিক সঙ্কট, আমাদের জাতীয় স্মারক তৈরির ব্যর্থতা, ব্যক্তিক সংস্কৃতির উপর ভিন্ন মতাদর্শ ও পণ্যবস্তুর আগ্রাসন, স্যাটেলাইট সংস্কৃতির মডেলে স্থানীয় সংস্কৃতির ঢুকে-পড়া, সর্বোপরি জাতীয় জীবনে বাংলা ভাষা-ঐতিহ্যের কেন্দ্র ভেঙ্গে দিয়ে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির এককেন্দ্রিকতা তৈরির গূঢ় রাজনীতি।

বস্তুত, সংস্কৃতির ভাবাদর্শ নির্ধারণের সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব বহু বৈচিত্র্যময়– শাখাপ্রশাখাময় সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণের নয়, তা দিয়ে একটি জাতীয় স্মারক তৈরি প্রয়াসে। বিশ্বায়নের স্যাটেলাইট সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে ব্যবসা, আদিবাসী একাডেমি স্থাপন, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লালন-হাসন রাজা চর্চা ইত্যাদি প্রয়াস এক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখছে, আদৌ কিছু রাখছে কি না, তা ভেবে দেখা আবশ্যক। জনবহুল বঙ্গীয় ভূভাগের অস্তিত্ব আজ যেমন শ্রমের দেশান্তরণে, বিশ্বব্যাপী অবাধ গমনাগমনের উপর নির্ভরশীল, তেমনি জাতীয়তাবোধের শক্তিকে সংহত ও বিকশিত করাও জরুরি– যদিও দেশে-দেশে এই জাতিতত্ত্ব সত্তরের দশকের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের হুমকিতে পড়েছে, অনেক দেশে জাতিতত্ত্ব যুদ্ধ-সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছে, জাতি-উপজাতির দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত হচ্ছে পৃথিবী। কিন্তু নিরবলম্ব ব্যক্তি তার নিছক ব্যক্তিগত সংস্কৃতি নিয়ে যেমন একা একা সাংস্কৃতিক বিশ্ব গড়তে পারে না বা রুচিশীল সংস্কৃতিমান মানুষ রূপে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি এই ব্যক্তিকে তার অস্তিত্ব-পরিচিতির জন্যেই জাতি-রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই বিকশিত হতে হয়। কীভাবে এই জাতীয় সংস্কৃতি তৈরি করা যেতে পারে? এ নিয়ে নানা তর্ক ও মতামত থাকতে পারে। একটি সূত্র দাঁড় করানো যেতে পারে যে, আমরা ঔপনিবেশিক পরাধীনতার জন্যে আধুনিক জাতিসত্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে যেতে পারিনি– যদিও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব হাজার বছরের, ইতিহাসে জাতি হিসেবে আমাদের আরম্ভটা সেভাবে কখনোই শুরু করা যায়নি– বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে শ্রেণি-ধর্ম-শাসকের প্রতাপে ও বিরুদ্ধতায়, সেই জাতিসত্তাই বিকাশের জন্যে একটি ঐকিক স্মারকনির্ভর হওয়া জরুরি। আর তা হতে পারে বাংলাভাষা– যার গর্ভে লুকানো আছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য, সহনীয়তা, মানবীয়তা ও নান্দনিকতা। কিন্তু ইংরেজি ভাষার পুনরাধিপত্য, হিন্দিভাষার আগ্রাসন, জনসংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ ইত্যাদি থেকে জাতীয় সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারে বাংলা ভাষার আশ্রয়েই। জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষায় শক্ত ভিত গড়ে না তুললে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

কোনোটাই বাঁচে না। এ-সূত্রে দরকার হয় দেশে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির বা বৈপ্লবিক শর্তে সংস্কৃতির বলয় গঠন করতে সমর্থ গোষ্ঠী, যারা একই সঙ্গে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সংস্কৃতিচর্চায় যুক্ত ও সৃজনক্ষম করে তুলতে সক্ষম। বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নেয়া সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভূমিকে রক্ষা করতে হলে ভাষার বাঁধ তৈরি করতে হবে। সংস্কৃতি-ভাবুক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটাই বলা যায় যে, নিজের ভাষাকে অনুশীলনে ঋদ্ধ করতে পারলেই জগৎসভায় আমরা কিছু দান করতে পারব– শুধুই গ্রহীতা হয়ে থাকব না। আমার ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে সাজাব আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভুবনকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষা

এ. কে. শেরাম*

মানুষের চলমান জীবন-প্রবাহের দীর্ঘ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো ভাষা। মানুষের 'মানুষ' হয়ে ওঠার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এই ভাষা-ই। আসলে ভাষা ছাড়া মানুষকে কল্পনাই করা যায় না। ভাষাবিহীন মানুষের পৃথিবী যেন খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত অজস্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। প্রতিটি মানুষ সেখানে একে-অপরের থেকে যোজন যোজন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটি প্রাণহীন ল্যাম্পপোস্টের মতো। ভাষা, এক অনুপম সেতুবন্ধ হয়ে, সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোকে গ্রথিত করেছে এক সূত্রে–প্রাণের অম্লান আলোয় গ্রন্থিবিহীন গ্রন্থিতে বেঁধেছে এক হৃদয়ের সাথে আরেক হৃদয়কে। এই ভাষারই গতিময়তায় অবগাহন করে প্রবাহিত হয়েছে সাহিত্যের সৃজন-স্বপ্নের ধারা–সংস্কৃতির অন্তঃসলিলা প্রবাহ। এভাবেই মানুষ নিজেকে ক্রমশ বিকশিত করেছে, করেছে পরিশীলিত। ক্ষুদ্র মানুষ সময়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে বিশাল ও মহৎ হয়ে উঠেছে–মাটির বুকে দাঁড়িয়েই অনন্ত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যাশার হাত। মানুষের এই ক্রমোত্থানের প্রধান বাহনই হলো ভাষা। কিন্তু ভূগোল ও ইতিহাসের নানা জটিল জটাজালে আটকে পড়ে মানুষ একসময় বিভাজিত হয়েছে নানা 'গণ' ও 'গোষ্ঠী'-তে; খণ্ডিত হয়েছে মানুষের ভাষা। বলা হয়, পৃথিবীতে এখন কয়েক হাজার ভাষা প্রচলিত–যেসব ভাষায় এখনো কিছু-না-কিছু মানুষ কথা বলে। কিন্তু আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেইসব ভাষার কমপক্ষে অর্ধেক হয় মরে যাবে, নয়তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাবে। আবার অনেকের মতে, আগামী একশত বছরের মধ্যে পৃথিবীর নব্বই শতাংশ ভাষাই মরে যাবে। আর ভাষা মরে যাওয়া মানে ইতিহাসের কৃষ্ণবিবরে একটি জাতির হারিয়ে যাওয়া–হারিয়ে যাওয়া তার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির। পৃথিবীতে প্রচলিত প্রতিটি ভাষাই কোনো-না-কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। আর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছেই তার মাতৃভাষা প্রবল প্রাণাবেগ আর ভালোবাসায় প্লুত প্রিয়তম ভাষা–বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ও উৎকর্ষের মানদণ্ডে সে ভাষার অবস্থান যতোই গৌণ বা নগণ্য, অপাংক্তেয় বা অনুল্লেখ্য হোক। পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রচলিত এইসব ভাষা সময়ের উপত্যকায় সমানভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। কোনো কোনো ভাষা সময়-পরিক্রমায় নিজস্ব সীমানা পেরিয়ে অবলীলায় অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি ও পরিচিতি। আবার কোনো কোনো ভাষা বৃত্তাবদ্ধ থেকে গেছে কেবলই

*বিশিষ্ট গবেষক ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নেতা

আঞ্চলিক বা জনগোষ্ঠীগত সীমানায়। তারপরও প্রতিটি জনগোষ্ঠীই চায় সারা পৃথিবী থেকে সমস্ত সৌন্দর্য তিল তিল করে এনে নিজ মাতৃভাষাকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলতে। কারণ, মাতৃভাষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ অহংকার। জন্মদাত্রী জননীর প্রতি বা দেশমাতৃকার প্রতি যেমন সন্তানের থাকে তীব্র আবেগ, তেমনি মাতৃভাষার প্রতিও থাকে এক সুতীব্র আবেগী চেতনা। আবেগের এই তীব্রতার কারণেই ১৯৫২ সালে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'তে মাতৃভাষার জন্যে নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার কোটি সন্তানকে ছাপিয়ে হঠাৎ উঁচু হয়ে ওঠা বাংলার নব-আলোকিত মানুষেরা–যাঁদের মধ্যে অন্যতম রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিউর প্রমুখ; রক্তগোলাপের মতো থোকা থোকা ফুটে ওঠা একগুচ্ছ নাম। আর এভাবেই 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র এই অমোঘ শক্তি বাঙালির পরবর্তী ইতিহাসের সকল চলমানতার মূল চালিকাশক্তি হয়েছে, জাতির ইতিহাস-শকটকে নানা ধাপ ও স্তর পেরিয়ে শেষাবধি পৌঁছে দিয়েছে প্রত্যাশার তুঙ্গশীর্ষ সীমানায়–স্বাধীনতার উজ্জ্বল উপত্যকায়। মানবেতিহাসের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্যে–ধর্মের কারণে আত্মদানের অসংখ্য ঘটনা ঘটলেও মাতৃভাষার জন্যে এই আত্মদান ছিল ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। আর তারই স্বীকৃতি হিসেবে 'ইউনেস্কো'র সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের মাধ্যমে এই দিনটি পরিণত হয়েছে আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এ। সারাবিশ্বের প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই তাই দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে একুশের চেতনা থেকে গ্রহণ করবে নিজ-নিজ মাতৃভাষাকে অধিকতর ভালোবাসার অনন্ত অনুপ্রেরণা।

আমরা জানি, মানুষের তিনটি অহংকারের বিষয় হলো–মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা। শুধু অহংকার নয়, মানুষের প্রধান ভালোবাসাও এই তিনটিকে কেন্দ্র করেই। আমরা অনেক কিছুই ভুলে যেতে পারি–বদলে ফেলতে পারি জীবনের অনেক বিষয়; কিন্তু মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা যেমন কখনোই বদলানো যায় না, তেমনি সম্ভব নয় ভুলে যাওয়াও। মানব-শিশুর প্রথম স্বজন হলো তার জন্মদাত্রী মা। দ্বিতীয় স্বজন তার মাতৃভূমি, যে তাকে মায়ের মতোই লালন-পালন করে অপার মাতৃস্নেহে। আর সেই মায়ের মুখের ভাষাই হলো তার মাতৃভাষা। মানুষের মা হলেন দু'জন–জন্মদাত্রী জননী আর বক্ষে-ধারণকত্রী দেশমাতৃকা। তাই কখনো কখনো মানুষের মাতৃভাষাও থাকে দু'টো–জন্মদাত্রী জননীর ভাষা আর দেশমাতৃকার ভাষা। তবে জন্মদাত্রী জননীর ভাষাই প্রতিটি মানুষের প্রথম মাতৃভাষা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর দেশমাতৃকার ভাষা হলো তার দ্বিতীয় মাতৃভাষা। মা এবং মাতৃভূমির পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই মাতৃভাষা, যাকে বলা যায় মানুষের 'জন্মদাগ', যে দাগ কখনো মুছে ফেলা যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে মা এবং মাতৃভূমিকে ছাপিয়ে মাতৃভাষাই প্রধান হয়ে ওঠে। কারণ, নশ্বর জীবনের নিয়মে মা একসময় আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন–জীবনের অনিবার্যতায় মাতৃভূমি থেকেও দূরে চলে যেতে পারি আমরা, কিন্তু মাতৃভাষা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে থেকে যায় আজীবন। মাতৃভাষাই তখন বাঁচিয়ে রাখে মা এবং মাতৃভূমিকেও। এই মাতৃভাষা এক অর্থে মানুষের 'জন্মদাগ', যে দাগ কখনো মুছে ফেলা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন, মানুষ

কোনো-না-কোনো সময়ে পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে ওঠে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে–তারপর জীবনের প্রয়োজনে হয়তোবা সে একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই জনগোষ্ঠী থেকে–কিন্তু কোনো কিছুই তার উৎস–সৃষ্টিমুখ মুছে দিতে পারে না, তার জন্মদাগ সে বয়ে চলে সর্বত্র। ঐ জন্মদাগ হলো তার মাতৃভাষা। পর্তুগিজ কবি ফার্নান্দো পেসোয়ার কাছে তো তাঁর স্বদেশ মানেই তাঁর মাতৃভাষা–'পর্তুগিজ'। যেখানেই তাঁর মাতৃভাষায় কথা বলা হয় সেখানেই তাঁর স্বদেশের অবস্থান। ফার্নান্দো পেসোয়ার কাছে এভাবে মাতৃভাষাই হয়ে ওঠে তাঁর স্বদেশের নামান্তর। মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার তাই মানুষের প্রধানতম মৌলিক অধিকার। অথচ আমরা জানি, আমাদের প্রাণের এই পৃথিবীতে তার অনেক প্রিয় সন্তান নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এটা শুধু মৌলিক মানবাধিকারের বরখেলাপই নয়–এক অর্থে অমানবিকও।

বাংলাদেশের প্রধান জাতিসত্তা বাঙালি এবং প্রধানতম ভাষা বাংলা। কিন্তু বাঙালি ছাড়া এদেশে যেমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকেদের বাস–তেমনি বাংলার পাশাপাশি এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা হিসেবে অনেক ভাষারও অস্তিত্ব বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ভাষার যেমন এক দীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে, তেমনি আছে লিখিত সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও। এপর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে মণিপুরী, চাকমা, সাঁওতালি, কক্‌বরক বা ত্রিপুরী, গারো, বিষ্ণুপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, মারমা, সাদরী, ম্রো, রাখাইন, হাজং, খাসি ইত্যাদি ভাষাগুলোর কথা। এগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ছয়টি ভাষার তো নিজস্ব লিপি-পদ্ধতিও আছে; যেমন মণিপুরী, চাকমা, সাঁওতালি, মারমা, কক্‌বরক ও ম্রো ভাষা। মণিপুরী এবং চাকমা লিপি ইতোমধ্যে ইউনিকোডের আওতায়ও এসেছে। প্রাচীনতা বা উৎকর্ষের বিচারেও অনেক ভাষা যথেষ্ট প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মণিপুরী ভাষা খুবই প্রাচীন; খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে লিখিত মণিপুরী সাহিত্যের নমুনা পাওয়া গেছে এবং উৎকর্ষের বিচারেও মণিপুরী সাহিত্য যথেষ্ট অগ্রসর। পূর্ব-ভারতে এর অবস্থান তৃতীয়–বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার পরেই। আবার মণিপুরী এবং সাঁওতালি ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সর্বভারতীয় পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হলেও ভাষাভাষীর সংখ্যা এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিবেচনায় আরও বেশ ক'টি ভাষাকে সেখানে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরকম ভাষার সংখ্যা ২২টি; এগুলোর মধ্যে হিন্দির পাশাপাশি বাংলা, মণিপুরী ও সাঁওতালি ভাষা আছে। এই তিনটি ভাষার কথা উল্লেখ করার কারণ বাংলাদেশেও এই তিনটি ভাষা প্রচলিত। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মণিপুরী ভাষা সেই প্রাচীনকাল থেকেই মণিপুর রাজ্যের রাজ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত হয়ে এসেছে। এই ২২টি ভাষার বাইরে ভারতের ২০০১ সালের আদমশুমারি বিবরণীতে দশ হাজার বা তার চেয়েও বেশি লোক কথা বলে এরকম আরও ১০০টি ভাষা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যদিও ঐ রিপোর্টে ভাষা ও উপভাষা মিলে ভারতে মোট ৬,৬৬১টি ভাষার অস্তিত্ব আছে বলে উল্লিখিত। সংবিধানের

অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত নয় বা 'নন-সিড্যুলড' ভাষার ঐ তালিকায় ওঁরাও, ত্রিপুরী বা কক্‌বরক, খাসি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, কোচ ইত্যাদি ভাষা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে বাংলা প্রধান ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা-ই শুধু নয়, এর উৎকর্ষ এবং অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও উজ্জ্বল অবস্থানের কারণে পাদপ্রদীপের সমস্ত আলো প্রক্ষেপিত হয়েছে কেবল এটির ওপরই, বাকি ভাষাগুলো থেকে গেছে পার্শ্বপর্দার অন্তরালে। কিন্তু যতোই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হোক, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে নিজ নিজ মাতৃভাষা-ই ভালোবাসার আঙরাখায় মোড়ানো প্রিয়তম ভাষা। প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা স্মরণে আনতে পারি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উদ্‌যাপনের কথা–যেখানে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা ভাষার জন্যে আত্মদানের এই মহান দিবসটি উদ্‌যাপিত হতো এক ভিন্ন আঙ্গিকে–'ভাষা দিবস' নামে। ত্রিপুরার রাজ্যভাষা এবং প্রধানতম ভাষা বাংলা। কিন্তু তারপরও ভাষা দিবসের সকল কর্মকাণ্ডে সরকারিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে রাজ্যের প্রায় সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে। সরকারি অনুষ্ঠানমালায় বা প্রকাশনায় বাংলা ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্তত পাঁচটি প্রধান ভাষাকে; কক্‌বরক, মণিপুরী, চাকমা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও হালাম-কুকি ভাষা ও সাহিত্য যেমন স্থান পায়–তেমনি সামগ্রিক অনুষ্ঠানমালায় সম্মিলন ঘটে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সেখানে নানা ভাষা ও জনগোষ্ঠীর জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অনুপম মেলবন্ধন ঘটে। একুশে ফেব্রুয়ারির 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বস্বীকৃতি বস্তুত সেই চেতনারই বৈশ্বিক রূপায়ণ। সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের প্রধান এই পাঁচটি ভাষার উন্নয়নে যথাযথ সরকারি ভূমিকা পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এইসব ভাষার জন্যে একটি পৃথক অধিদপ্তর চালু করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। এখানে বাঙালির পাশাপাশি বসবাসরত চাকমা, গারো, মণিপুরী, মারমা, ত্রিপুরা, খাসি, সাঁওতাল, রাখাইন প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাগুলো এখনও সেই রূপ স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি। স্বীকার্য, এদের প্রায় সকলেরই রয়েছে এক সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। *ফলে, বাংলা ভিন্ন এদেশের অন্য ভাষাগুলো সাংবিধানিক, সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের স্বীকৃতিবিহীন অবস্থায় অবহেলায়-অবজ্ঞায় ক্রমশ ক্লিষ্ট হতে হতে আজ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মুখে*। আসলে বাংলাদেশের বিশাল প্রসেনিয়ামে উজ্জ্বল স্পটলাইট পতিত হয়েছে কেবল বাঙালি এবং বাংলা ভাষার উপরেই। অন্যদিকে স্বজন বান্ধবহীন এই ভাষাগুলো তাই ক্রমাগত অভাব আর অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে ক্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়ছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তাসমূহ এবং তাদের মাতৃভাষার প্রতি পরিপূর্ণ আলোক প্রক্ষেপণের।

বাংলাদেশ তো সেই মহান দেশ যে দেশের অকুতোভয় সন্তানেরা মাতৃভাষার জন্যে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, যে ইতিহাস আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের মাধ্যমে আজ এই গৌরবময় দিনটি সমগ্র বিশ্বে পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট', যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ,

পরিচর্যা ও বিকাশের ক্ষেত্র সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আমরা তাই সঙ্গত কারণেই প্রত্যাশা করি, সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলোকে রক্ষা করা, পরিচর্যা ও বিকাশ সাধনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আর এই লক্ষ্যে উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষাসমূহকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। আমাদের প্রত্যাশা, এই নবতর ইতিহাস সৃষ্টির মহতী কর্মযজ্ঞের সূচনা হোক অনেক অনন্য ইতিহাসের নির্মাতা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকেই। আর এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে রাষ্ট্রকেই–আর সহযোগিতার কল্যাণী হাত বাড়িয়ে অগ্রজের মহান ঔদার্যে এগিয়ে আসতে হবে এদেশের প্রাগ্রসর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে।

মাতৃভাষায় জাতিসত্তার প্রসঙ্গ

প্রফেসর ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন*

'মাতৃভাষা' শব্দটি আমাদের এই ভূখণ্ডে এক বিশেষ অনুভবে দীপ্যমান। এর কারণ, আমরা বাঙালি জাতি মাতৃভাষার জন্য মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছি। রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তা সহজে হয়নি। বাঙালিরা বাংলায় কথা বলতে পারবে না, তাদের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। পাকিস্তান রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এ নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে, শেষে প্রাণ দিয়ে মাতৃভাষাকে নিজের করতে হলো। তাই এর জন্য আমাদের অনুভব আলাদা। তবে মাতৃভাষা বিষয়টি অনেক বড়। জাতিগতভাবে, সংস্কৃতিগত বা নৃতত্ত্বে, রাজনৈতিক বা ইতিহাসগতভাবে এর তাৎপর্য বহুদূর পরিব্যাপ্ত। আমরা গর্বভরে স্মরণ করি যে, বায়ান্নতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে জাতিভিত্তিক তথা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে 'বাংলা' নামের যে দেশ তার নৃ-পরিচয়ে জাতি হিসেবে বাঙালি, যা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত সংবিধানের চার মূলনীতির অন্যতম। এটি বাংলাদেশের জন্ম পরিচয়। ভাষা-সংস্কৃতি-জাতিভিত্তিক দেশ এই বাংলাদেশ। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাশহীদ দিবসটি এখন বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। তাহলে ইতিহাস পরিক্রমায় বায়ান্ন থেকে একাত্তর, মাতৃভাষা-অধিকার প্রতিষ্ঠার পর সেই ভাষাভিত্তিক দেশ; এরপর আরও সিকি শতাব্দী অতিক্রমের পর ভাষাশহীদ দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। কার্যত, মাতৃভাষার অধিকার কায়েম হওয়ার ভেতর দিয়ে গোটা পৃথিবীতে স্ব স্ব মাতৃভাষার অধিকার দেশে দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে– একুশে ফেব্রুয়ারি সর্বদৈশিক হয়ে উঠেছে আর ভাষার পরিচয়টিতে যে জাতির পরিচয় নিহিত আছে তাও সকল দেশই গ্রহণ করেছে এবং বাঙালিকে প্রতিপাদ্য ও অনুসরিতরূপে পেয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ক্রমবিকশিত মাতৃভাষার প্রতীকে গর্বিতরূপে সমাদৃত হয়েছে। এই সমাদর বাঙালি জাতির– যার মাতৃভাষা বাংলা।

আমরা এখন গর্বভরে উচ্চারণ করি, বাংলা আমার মাতৃভাষা আর আমার দেশ বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ বহু বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে প্রতিটি বিষয়েই রয়েছে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য। এই বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারেই রয়েছে বিবিধ রতনের সন্ধান। একসময় এই

*উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূভাগে নদ-নদী, বনাঞ্চল, সমতল-পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্য মিলে মানুষের বসতি ছিল। তাদের জীবনযাপন আর সংগ্রামের ভেতরেই ভাষা গড়ে ওঠে। বাংলায় কৌম জীবনাচরণ-সংস্কৃতি ভাষাকে নিজস্ব-ঐতিহ্য দিয়ে পুনর্গঠিত করে। তবে ভাষা ক্রম-পরিবর্তনশীল। বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসী বাস করে। তাদেরও মাতৃভাষা আছে। তাঁরাও নিজ ভাষার প্রতি একইভাবে আবেগপ্রবণ। এদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডার রয়েছে। প্রসঙ্গত, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষাভাষীরা পৃথিবীতে ষষ্ঠ; আর পুনর্বার বিশেষভাবে উল্লেখ করি বাংলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র এই বাংলাদেশ। বাংলাভাষা ও বাঙালি ঐতিহ্য হাজার বছরের। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাস করে। তাদেরও মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা এককভাবে বাংলা নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি আর বাংলাদেশের বাঙালি অভিন্ন সংস্কৃতির দ্যোতক হলেও আর্থ-রাজনীতি ও সংগ্রামের ইতিহাসে তারা ভিন্ন। কারণ, বায়ান্নর ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির সংগ্রামের ভেতরে পাকিস্তান-উপনিবেশের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মুক্তিসংগ্রামের ভেতর দিয়ে অর্জিত যে দেশ– সেটি পশ্চিমবঙ্গের ভূভাগের নয়, তাদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আলাদা। যেটি বলতে চাই, পৃথিবীব্যাপী মাতৃভাষা সংখ্যাগুরু বিভিন্ন ভাষা তথা বাংলা বাঙালিদের কাছে যেমন প্রাণের ভাষা তেমনি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভিত্তিক বা পৃথিবীব্যাপী অধিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষাও ওই জাতির কাছে প্রাণপ্রিয়। তারা দাবি করে মাতৃভাষার অধিকারের সুরক্ষা। যে কারণে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়– তা হলো ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষা করা, জাতিভিত্তিক মাতৃভাষার অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। মাতৃভাষার ক্রমবিকশিত রূপ তাতে প্রকাশ পায়, সংরক্ষিত হয়। ভাষা সুরক্ষিত হলে বৈচিত্র্য নিশ্চিত হয়, কারণ বৈচিত্র্যই তো জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, মানবসম্পদের সার্থকতা। আর সে লক্ষ্যেই সভ্যতার অপরিহার্যতা চিরজীবী হয়ে থাকতে সক্ষম হয়।

এখন প্রশ্ন, বাঙালির বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বাংলাভাষাও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু এ ভূখণ্ডের অন্য জাতিসত্তাগুলোর ভাষার অবস্থা কী? চাকমা, মারমা, খাসিয়া ইত্যাদি ভাষার সুরক্ষায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নিয়েছে– তাদের স্বাধীনতা কতোটুকু সুরক্ষিত না-কি ওইসব ভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির কর্তৃত্ব-প্রবাহে হারিয়ে যেতে বসেছে ইত্যাদি প্রশ্ন দেখা দেয়। সেজন্য একই ভূখণ্ডে বাস করে এমন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। একদিকে যেমন আমাদের মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা প্রয়োজন তেমনই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা তথা তাদের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও পরিবধর্নের দায়িত্বও বর্তায় আমাদের উপর। তা না হলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার আধিপত্যে হারিয়ে যেতে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে সমাজ-ভাষায় 'ভাষা-সরণ' তো একটি সমস্যাই। বিশেষ করে, অভিবাসীরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে এমনটা ঘটে। এতে একভাষীরা অন্য ভাষায় চলে আসে– সেটাই হয় তাদের মাতৃভাষা। অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা এক্ষেত্রে

উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত। এপ্রক্রিয়ায় তার সংস্কৃতিকে গ্লোবাল কর্পোরেট সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এরূপে দেশে দেশে ভাষা তো বটেই তার সংস্কৃতিও সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বের ফাঁদে পড়ে। বিষয়গুলোর বাস্তব ফল বা লজিস্টিক সমর্থনের জায়গা যতোই সীমিত হোক, নিশ্চয়ই এর চেতনাগত মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এদেশে পার্বত্য এলাকায় কখনও কখনও পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাত লাগে, পাহাড়িরা তাদের ভূমিতে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, তাদের ভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীদের দ্বারা। এজন্য যুগান্তকারী পার্বত্য চুক্তিটির কার্যকর হওয়া অধিক প্রয়োজন। এর ভেতর দিয়ে ভাষা-সংস্কৃতি জাতিসত্তার অধিকার ও সংরক্ষণটি কায়েম হতে পারে। প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার। তাতে করে মাতৃভাষারও সংরক্ষণ শক্তি বাড়তে পারে। নিজ নিজ ভাষা তার কৃষ্টি সংরক্ষণের ভেতর দিয়ে অটুট থাকে। আর ভাষা সুরক্ষিত হলে বৈচিত্র্যও বজায় থাকে; বাংলাদেশ একটি সমতাভিত্তিক সংস্কৃতির রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত ও সম্মানিতও হতে পারে। আর সম্মানের চাইতে এটিও তো বড় কথা যে, আমরা জাতি-সংস্কৃতির ভিন্নতায় ঐক্য গড়ি, বন্ধন বৈচিত্র্যে অটুট থাকি– যার কৃত্য ওই সংবিধানের মূলমন্ত্র বা স্বাধীন মানুষ হিসেবে এক হয়ে বেঁচে থাকারও শর্ত। আমরা ভুলে না যাই– 'ধর্ম যার যার দেশ সবার' বাণীটি। একটি জাতির বৈচিত্র্য ও কৃতিত্ব অটুট থাকলে সেখানে বৃহত্তর অর্থে লাভবান হয় সংখ্যাগরিষ্ঠই– বাঙালিরাই আরও উন্নত, সমৃদ্ধ জীবন পেতে পারে। বস্তুত, মাতৃভাষার অধিকার সুরক্ষণে বাঙালিদের যে ত্যাগ সেটি পৃথিবীতে বিরল ঘটনা। সেই অভিজ্ঞতা যদি আমরা আমাদের ভূখণ্ডেই কায়েম করতে না পারি তবে মাতৃভাষার বিকাশ কীভাবে ঘটবে! মাতৃভাষা দিবসের নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে আমরাই কী বিশ্ববাসীর কাছে ছোট হয়ে যাই না!

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর সব জাতি তথা নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সুরক্ষিত করতে হবে। তার কারণ, ভাষাই জাতির মুখচিত্র। ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ভেতর দিয়েই ভূখণ্ডের বৈচিত্র্য রক্ষা পায়। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার সপক্ষে বলেছেন: 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। ভাষা হচ্ছে সৃষ্টির বাহন। মাতৃভাষাতেই নিজেকে সহজে প্রকাশ করা সম্ভব। 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন 'দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেন না নিশ্চিত জানি পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ– শিক্ষার পরধর্ম।' উপর্যুক্ত কথাগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্র-উক্তির বিস্তর ব্যাখ্যা তৈরি হতে পারে। মাতৃভাষার চিরন্তন গুরুত্বটি অনুধাবন করা সম্ভব হয়। চিত্ত ও শিক্ষা এক করে না দেখলে কিছুই হয় না। সংস্কৃতিবান হওয়া তো দূরের কথা। মাতৃভাষাটিকে আমলে নিয়েই শিক্ষা ও শিক্ষা অর্জনের বিস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। নইলে আমরা কেউই কোনো আদর্শকে জাতি-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। চিত্তের প্রসারণ, জাগরণ, সম্পৃক্তি যাই বলি না কেন, তা তো মাতৃভাষা ছাড়া সম্ভব নয়। এটি পুরনো কথা। আজকে আধুনিক প্রযুক্তিমুখী রাষ্ট্রের কথা বলা হচ্ছে। সেটির প্রসারণও ঘটছে বেশ দ্রুততার সঙ্গে। কিন্তু প্রযুক্তির প্রচারের মুখে মাতৃভাষা কিন্তু নানাভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ছে। ক্রমবিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। গ্লোবাল শর্তে, আধিপত্যের

কর্তৃত্বে, অর্থনৈতিক চাপে, বাণিজ্যিকীকরণের রাহুগ্রাসে উন্নয়নশীল দেশের ভাষা-সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। মাতৃভাষায় অধিকার নেই। তাই চিত্তের যোগও অবসিত। তাতে অস্তিত্ব অধিকার বা স্বাধীন চিন্তার সুযোগ অনতিক্রান্ত বৃত্তে আটকে যাচ্ছে। এখনও তাই সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলা চালু হয়নি। সে পথ সম্প্রসারিত হওয়ার বদলে সংকুচিত হচ্ছে। প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর খুঁজি– কাজগুলো যেহেতু আমাদের। মাতৃভাষার ইনস্টিটিউট হয়েছে– সরকার অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে, ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু কাজের প্রবৃদ্ধি কীভাবে ঘটছে? আমরা কতোটুকু এর সুফল বিভাগ-জেলা বা উপজেলাপর্যায়ে পৌছুতে পারছি? মাতৃভাষার ক্রম-সম্প্রসারণে এ ইনস্টিটিউট কীভাবে কাজ করছে– তার নবায়ন কীভাবে ঘটছে, এর বিস্তৃতির প্রান্তগুলো কীভাবে নির্ণীত হচ্ছে– এগুলো পরীক্ষা করা দরকার। কর্পোরেট পুঁজি তার স্বার্থমতো অবহেলা করবে অনেক কিছু, কিন্তু আমরা বিজয়ী জাতি, গোটা বিশ্বে মাতৃভাষার নেতৃত্বদানকারী জাতি– তাই আমাদেরই তো সবটুকু সুরক্ষা করতে হবে। আমাদেরই ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। ভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীকে যথোচিত সম্মান দিতে হবে– তাদের নিজভাষা সুরক্ষার ভেতর দিয়ে। বিষয়গুলো শুধু একটি দিনে বা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তৃণমূল থেকে সচেতনতা দরকার। সকলপর্যায়ে কাজ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন: 'যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়ত ধরতে পারবেন না, কেন না অনেকেরই কানে আমার সেই পুরনো কথা পৌছয় নি।... সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।' তাই অনেক কথার পুনরাবৃত্তি শ্লাঘারও বটে।

ভাষার সমাজতত্ত্ব আছে। ভাষাযোগে পুনর্গঠিত হয় মাতৃভাষার কর্তৃত্ব ও ক্রমবিকাশ। তাতে বৈচিত্র্য অন্যতম অনুষঙ্গ। একই সমাজে যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর বাস সেটি স্বীয় স্বাধীনতায় অধিকার ও প্রয়োগের উপলক্ষ জরুরি। এতে করে অন্তত ক্ষুদ্র-বৃহৎ অন্তর্লীন হবে না। সমাজভাষার পাঠে উইলিয়াম ব্রাইট বা নেউস্তপনি বলেন: 'ভাষার বহুভাষিকতা'র প্রসঙ্গ। কার্যত, এর মধ্যেই সকল স্তরের মানবিকবোধের প্রশ্নটি জড়িত। জাতিসত্তার বৈচিত্র্য তথা বহুভাষিকতার ক্রমবিকশিত শক্তির ভেতরেই মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি রক্ষিত, স্বাতন্ত্র্যও উজ্জীবিত। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হয় তাতে এটি অনন্য গৌরবেরই শুধু নয় বিশ্বের সকল জাতিসত্তারই অমলিন দৃষ্টান্ত। আগেই বলেছি, এ দেশের অভ্যন্তরীণ চেতনার যে শক্তি তা ওই জাতিসত্তাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত। মাতৃভাষার ভেতরেই জাতির দীপ্তি পুনর্গঠিত। বৈচিত্র্যও পেতে হবে ওরই ভেতরে। ঠিক এ কারণেই মাতৃভাষাকে বাঁচাতে হবে। জাতিসত্তার সকল প্রান্ত স্পর্শ করতে হলে মাতৃভাষা চর্চার যেমন বিকল্প নেই তেমনি বৈচিত্র্যের সংস্কৃতিও উদ্ধার বা পুনরুদ্ধার হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টির আরও গভীরে আলোচনার অবকাশ রাখে। কিন্তু এপর্যায়ে আপাত চৌম্বক অংশই প্রধান উদ্দিষ্ট মনে করছি। বক্ষ্যমাণ আলোচনাটি জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার যোগে কিছু চিন্তন-কাঠামো

নির্দেশক। তাতে উপর্যুক্ত প্রতিপাদ্যে সর্বসাকুল্যে যেটি অনিবার্য জ্ঞান করতে চাই তা হলো, এসম্পর্কিত আমাদের চলতি প্রাত্যহিক কার্যসূচিটির বদল ঘটানোর প্রস্তাব। কারণ, বর্তমানে কোনো কিছুই স্থির নয়। সমাজ পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তির ব্যবহারে তা আরও তড়িৎ গতিময়। সেপর্যায়ে একটি জাতির কার্নিভাল বা উৎসবচেতনা এখন পুনরুত্থিত (rivival) রূপে পরিগণিত। তাতে মাতৃভাষা নানা বর্ণে-ছন্দে ও রেখায় আমাদের সামনে প্রকাশিত। বর্তমান রাষ্ট্রও অনেক প্রতিকূলতার ভেতরে তার পৃষ্ঠপোষণা দিচ্ছে। একুশ এলে জাতির জাগরণ চোখে পড়ে। কোনো না কোনোভাবে অন্য জাতিসত্তার ভেতরেও তার বিচ্ছুরিত স্বপ্নরেখা ছুঁয়ে যায়– সেখানে এই ভূখণ্ডের ঐতিহ্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর উপরও একই বার্তায় নিঃসঙ্কোচে গৃহীত হয়; তারা ক্ষুদ্র নয়, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপটি তারাও তুলে ধরতে সক্ষম এবং কৃষ্টির উপলক্ষে তা ধরে রাখতে হবে চিরপ্রবহমান– এই সত্যটি তাদের ভেতরে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমাদের মতো করে বিশ্বের নানা উপকূলে তা পৌঁছে যাক, সব জাতি তা গ্রহণ করুক– যার যার ঐতিহ্যমাফিক। অনন্য উদারতায় রক্ষা করুক প্রত্যেকে প্রত্যেকের কৃষ্টি-বৈচিত্র্য। তখনই এ পৃথিবী সকলের শান্তিপূর্ণ বাসযোগ্য হয়ে উঠবে এবং আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে হয়ে উঠবে মহিমামণ্ডিত।

দলিত জনগোষ্ঠীর ভাষা : নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের সম্ভাব্যতা

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম*

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আমাদের বোঝাপড়া ও উপলব্ধি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। ভাষাবিষয়ক জরিপ পরিচালনা, কোন্ ভাষায় কত জন লোক কথা বলে, তা নিরূপণ, ভাষাসমূহের মধ্যে কোনটি বিলুপ্তপ্রায় সেটি চিহ্নিতকরণ অথবা ভাষার কাঠামো নিয়ে গবেষণা– এগুলো নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান। কিন্তু এর বাইরেও এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো নিয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এ ইনস্টিটিউট সমাজ ও রাজনীতির গূঢ় প্রশ্নগুলো নিয়ে গভীরতর ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে,– চিন্তার সঙ্কীর্ণতা পেরিয়ে যেতে সহায়ক হতে পারে। আত্মপরিচয় অন্বেষণ, সমাজ কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধি, সামাজিক অসমতা ও বঞ্চনার গড়ন ও প্রকাশ বিশ্লেষণ, ভাষার সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক দাপট কিংবা প্রান্তিকতার আন্তঃসম্পর্ক ঐতিহাসিকতার আলোকে দেখা– এগুলো সমাজতাত্ত্বিক ও নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভাষাবিষয়ক গবেষণায় সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ উন্মোচন।

ভাষাবিষয়ক গবেষণার এই বিপুল সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটি গবেষণার বিষয়ে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই– যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

এ দেশে বাঙালি ভিন্ন অপরাপর জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা মূলত সেসব জনগোষ্ঠীর দিকে মনোযোগী হয়েছি যাদেরকে 'আদিবাসী' বা 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বলে চিহ্নিত করা হয়; এই জনগোষ্ঠীসমূহের প্রতিও যে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তা নয়। যাই হোক, এই জনগোষ্ঠীসমূহের বাইরে এখানে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বঞ্চিত আরও কিছু জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং যারা এদেশের গবেষক, চিন্তাবিদ, নীতিনির্ধারক কিংবা অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামান্যই নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। নানা সময়ে 'অন্ত্যজ', 'হরিজন, 'নমশূদ্র', 'তফসিলী সম্প্রদায়' বা 'তফসিলি জাতি-বর্ণ' (শিডিউল কাস্ট) হিসেবে চিহ্নিত এই জনগোষ্ঠীসমূহ সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের 'দলিত'

*উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মপরিচয়ে চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। 'দলিত', 'দালিত' বা 'দালিত্যস্য'– আত্মপরিচয় নির্দেশক পদ হিসেবে এগুলোর ব্যবহার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে বেশ আগে থেকেই ছিল। দলিতদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনেরও সেখানে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই 'দলিত' পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার সম্ভবত একদশকের অধিক পুরোনো নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পদটির ব্যবহার যথাযথ কি-না বা যে জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয় তারা এতে পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কি-না, সেটি ভিন্ন আলোচনার বিষয়। কিন্তু বহু দিন থেকে অবহেলিত ও উপেক্ষিত আমাদের সমাজের সবচেয়ে অমর্যাদাকর জীবনযাপনকারী জনগোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণে নিঃসন্দেহে এই পদটির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। এটি বঞ্চনা ও অধিকারহীনতার এমন এক চর্চাসম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা সমাজ কাঠামো ও সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। এটি এমন জনগোষ্ঠীর কথা সামনে আনে যাদের সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা ও অস্বীকারের প্রবণতা বিস্ময়কর বটে।

দলিত কারা?– দলিত আত্মপরিচয় নির্মাণের ভারতীয় ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবু সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'দলিত' পরিচয়টি 'জাতি-বর্ণ' বা 'জাত-পাত' বিভাজন ব্যবস্থা তথা 'কাস্ট সিস্টেম'-এর সঙ্গে যুক্ত। এরা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সব থেকে নিচুস্তরের মানুষ। মূলত ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত, বৈদিক জীবন ব্যবস্থায় উদ্ভূত সামাজিক ক্রমোচ্চবিন্যাসের সুসংহত ব্যবস্থা হলো বর্ণাশ্রম। এখানে কিছু নির্দিষ্ট পেশার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয় সমাজের সব থেকে নিচুস্তরের ও 'অস্পৃশ্য' হিসেবে। এই অস্পৃশ্যতা ও নিচু মর্যাদা বংশপরম্পরায় স্থানান্তরিত এক অনপনেয় দুরবস্থার সূচক। অমর্যাদাকর পেশায় এই নিচু জাতের জনগোষ্ঠীকে থেকে যেতে হয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এ এক বদ্ধ কাঠামো যার বলবৎকরণ নিশ্চিত করা হয় 'অন্তর্বিবাহ' বা 'অ্যান্ডোগেমি' চর্চাকে রীতিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে।

তাহলে দলিতরা হলো জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় 'বর্ণহীন' বা 'কাস্টলেস' বলে চিহ্নিত সেইসব বহু সম্প্রদায়ের ও নানা পেশার মানুষজন যারা বংশ-পরম্পরায় অস্পৃশ্যতা, অমর্যাদা, পীড়ন ও অধিকারহীনতার হীন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং যারা মানুষ হয়েও পুরোপুরি মানুষ নয়।

বাংলাদেশের সমাজে জাত-পাতের বিভাজন আছে। এমনকি এঅঞ্চলের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে প্রচলন দেখা যায় তাতেও জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় বলে সমাজবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন (দ্রষ্টব্য: আরেফিন ১৯৭৭; আরেফিন ১৯৮২; চৌধুরী ২০০৯)।

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আমাদের সমাজে উপস্থিত থাকার পরও আমাদের জন-মানসে একে অস্বীকার করার প্রবণতাই প্রবল। বিভাজন, পীড়ন ও অস্পৃশ্যতার যে চর্চা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে করি, তাকে অস্বীকারের 'সুযোগ' বা 'অজুহাত' আমরা পেয়ে যাই সম্ভবত

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হবার কারণে। কিন্তু সেটি নিশ্চয়ই একমাত্র কারণ নয়; সংখ্যাল্পতার দোহাই ও অন্যান্য বিবিধ কারণ আমাদের চরম উদাসীনতার ক্ষেত্র তৈরি করে। আমাদের গণমাধ্যম, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, জাতীয়তাবাদের ডিসকোর্স এবং রাজনৈতিক বাগ্মিতা যেভাবে 'সমসত্ত্ব' বা 'হোমোজীনিয়াস' আত্মপরিচয়ের কথা বলে সেটিও সম্ভবত অস্বীকারকরণ ও উদাসীনতাকে বৈধতা দেয়। তবে আরও কিছু কারণও রয়েছে যেজন্য দলিত জনগোষ্ঠী আমাদের নীতি-পরিকল্পনা থেকে যেমন দূরে রয়ে গিয়েছে তেমনি আমাদের প্রাত্যহিক ডিসকোর্সে উঠে আসেনি বা আমাদের যৌথ কিংবা ব্যক্তিক চৈতন্য ও ভাবনাকে নাড়া দিতে পারেনি। এসবের মধ্যে একটি বড় কারণ হলো দীর্ঘকাল থেকে চরম লাঞ্ছনা ও ভাগ্যহীনতার জীবনযাপন করার কারণে তাদের চৈতন্যে হেজিমনিক আদর্শের প্রতি এক ধরনের প্রশ্নহীনতা বা সম্মতি সম্ভবত তৈরি হয়ে যায় (জেনে ২০১১)। ইতালিয়ান তাত্ত্বিক গ্রামশির শরণ নিলে এই 'নিম্নবর্গীয় চৈতন্য' বিষয়ে একটি বোঝা-পড়া হয়তো আমরা দাঁড় করাতে পারব। হতে পারে ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ হয়ে যাওয়া জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামোকে একপর্যায়ে তারা 'অনিবার্য' বা 'অপরিবর্তনীয়' বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। আরেকটি কারণ হলো, এই জনগোষ্ঠীগুলো চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দেশের নানা অংশে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যে কোনো যৌথ চৈতন্য জাগ্রত হওয়া বা সংগঠিত আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়নি। তদুপরি এই দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জীবনে বিপন্নতা এতটাই তীব্র যে তাকে অতিক্রম করে কোনো বিকল্প ভাবনা (যেমন, আন্দোলন বা প্রতিরোধের চিন্তা) তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে এই দলিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে আবার নানা পর্ব ও বাঁক-ফেরার ঘটনা রয়েছে। এ জনগোষ্ঠীসমূহের কোনো যৌথ আত্মপরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলন আকার না পাওয়ার এটিও একটি কারণ বটে। গবেষকগণ অস্পৃশ্যতার শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মোটাদাগে তিনটি বর্গ চিহ্নিত করেন (ইসলাম ও পারভেজ ২০১৩): বাঙালি দলিত, অভিবাসী দলিত ও মুসলিম দলিত।

এই তিন বর্গভুক্ত মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ন্যূনপক্ষে ৫৫ লক্ষ বা তার অধিক বলে অনুমান করা হয়েছে (ইসলাম ও পারভেজ ২০১৩; উদ্দিন ২০১৪)। কেবল সমস্যার প্রকটতাকে উপলব্ধিতে নেয়ার জন্য আমরা লক্ষ করতে পারি যে, এদেশের বাঙালি ভিন্ন অপরাপর জাতিসত্তাসমূহের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই দলিত জনগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি। এটি অবশ্যই জাতিসত্তাকেন্দ্রিক আলোচনাকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করার জন্য উল্লেখ করা নয়।

তিন বর্গের দলিতদের মধ্যে 'অভিবাসী' দলিতদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। কীভাবে এই দলিতরা তাদের এ বঞ্চনা ও অধিকারহীনতার জীবনেও নিজ ভাষাকে চর্চা করে যায় সেটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় বটে। এই ভাষাচর্চা তার সত্তা, স্বাতন্ত্র্য এবং প্রান্তিকতাকে কীরূপে আকৃতি দেয়? সমাজ, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয়, প্রান্তিকতার মিথস্ক্রিয়ায়

ভাষাচর্চা কী ভূমিকা পালন করে? অথবা এই বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রান্তজনের এই ভাষা কী রূপ পরিগ্রহ করে?

দলিত জীবনের ভাষা তার সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করে তাহলে যে গবেষণা পরিচালনার কথা ভাবা যেতে পারে তার মূল লক্ষ্য হবে ভাষা সংরক্ষণের প্রশ্নকে ঘিরে নয়, বরং তার লক্ষ্য হবে এই প্রশ্নগুলোর অনুসন্ধান: চরম প্রান্তিক দশায় একটি জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কীভাবে তার ভাষাচর্চা করে যায়? কীভাবে তার ভাষা তার বঞ্চনাকে ধারণ ও প্রকাশ করে? কীভাবে বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে সে তার ভাষার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে? জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও চৈতন্যগত যে দশা তার পরিপ্রেক্ষিতে তার ভাষাচর্চাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে? এপ্রশ্নগুলোর সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বা এথনোলিঙ্গুয়িস্টিক অধ্যয়নই হতে পারে এ গবেষণার লক্ষ্য। মাঠপর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে সুইপার, ডোম, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা চা-বাগানের শ্রমিকদের মাঝে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, ভাষা তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা– দুটো প্রশ্নই কেন্দ্রীয় মনোযোগ দাবি করে।

সূত্রপঞ্জি

Arefeen, H.K.S. (1977). 'The concept of castes among the Indologists', Centre Paper, No. 2. Dhaka, Centre for Social Studies, Dhaka University.

Arefeen, H.K.S. (1982). 'Muslim Stratification Patterns in Bangladesh: An Attempt to Build a Theory', The Journal of Social Studies, 16: 51–74.

Chowdhury, I.U. (2009). 'Caste-Based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh', Working Papers Series, Vol. 3(7). New Delhi, Indian Institute of Dalit Studies.

Zene, C. (2011). 'Self-Consciousness of the Dalits as "Subalterns": Reflections on Gramsci in South Asia', Rethinking Marxism, Vol. 3(1): 83–99.

Uddin, M. N. (2014) Benchmarking the Draft UN Principles and Guidelines on the Elimination of Discrimination based on Work and Descent, Nagorik Udyog: Dhaka.

ইসলাম, মাজহারুল ও পারভেজ, আলতাফ (২০১৩) বাংলাদেশের দলিত সমাজ: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা, নাগরিক উদ্যোগ: ঢাকা।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীয় ভাষাচর্চা: যেতে হবে বহুদূর

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা*

পাহাড়ের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী ম্রোদের একটি লোকশ্রুতি রয়েছে- সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর সকল জাতির জন্যে লেখ্য ভাষা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নেমে এসে একবার অক্ষর বিতরণ করেন। তখন আনন্দ ফুর্তিতে ব্যস্ত থাকায় ম্রোরা আসতে পারেনি। পরে সকলের মাঝে অক্ষর বিতরণ শেষে সৃষ্টিকর্তা ডুমুর পাতায় অক্ষর লিখে একটি গরুকে ম্রোদের কাছে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে ক্ষুধার্ত গরুটি ম্রোদের জন্যে পাঠানো লেখাসহ ডুমুরের পাতা খেয়ে ফেলে। ফলে ম্রোদের কাছে অক্ষর আর পৌঁছায়নি। সেদিন থেকেই ম্রোরা গো-হত্যা উৎসব উদ্‌যাপন করে আসছে।

আবার ত্রিপুরাদের লোকশ্রুতি অনুসারে সেই অক্ষর বিতরণ সভায় ত্রিপুরা জাতির প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিল না। তাই তাদের কাছে পাঠানো হয় একটি কাঁঠাল পাতা, যা বহনের দায়িত্ব পায় একটি ছাগল। ছাগলটিও বহু পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে ত্রিপুরা জাতির কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং কাঁঠাল পাতা খেয়ে ফেলে। সেদিন থেকে ত্রিপুরাদেরও অক্ষর নেই। ভাগ্যিস্, এ কারণে 'ছাগল বলি'র কোনো উৎসব ত্রিপুরাদের মাঝে প্রচলিত হয়নি।

অনেকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মতো বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীয় ভাষার বর্তমান অবস্থা বলতে গিয়ে দুটো লোকশ্রুতি বলে ফেললাম। তবে এর পেছনেও যুক্তি রয়েছে। ভাষা বিকাশের অন্যতম স্তর হলো কোনো ভাষার লেখ্যরূপ, লিপি ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রবর্তন। ভাষা বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তর সম্পর্কে আলো-আঁধারির লোকশ্রুতি অনেকটা এ দুটো ভাষা-সভ্যতার সঙ্গে স্থূল রসিকতারই মতো।

সে যাই হোক। এখন আসা যাক বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীসমূহের ভাষাগুলোর বর্তমান অবস্থার বিষয়ে। অফিসিয়ালি বাংলাদেশ কিন্তু একটি এক ভাষার দেশ। অন্তত আমাদের সংবিধান সেটাই বলে। কারণ, আমাদের সংবিধানে বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার অস্তিত্ব নেই। সংবিধানে বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়নি (দেখুন- বাংলাদেশের সংবিধান পঞ্চদশ সংশোধনী; ৯ নং অনুচ্ছেদ)। কিন্তু বাস্তবতা হলো দেশে

*নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি

মূলস্রোতের বাংলাভাষী মানুষ ছাড়াও কমবেশি প্রায় পৌনে একশত বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। মহান সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ২৩ (ক) অংশে এসব জাতিগোষ্ঠীর স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষা ও উন্নয়নে রাষ্ট্রকর্তৃক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ।

তারা দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বসবাস করে। তিনটি পার্বত্য জেলায় অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীয় জনগণের বসবাস হলেও বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পঞ্চগড়, বগুড়া, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, গাজীপুর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলেও তাদের অবস্থিতি দেখা যায়। বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীয়রা মোটামুটি চারটি ভাষা পরিবারেই কথা বলে; অস্ট্রো-এশিয়াটিক, চীনা-তিব্বতি, ভারতীয়-আর্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- খাসি, কোডা, মুন্ডারি, প্লার, সাঁওতালি, ওয়ার-জৈন্তিয়া। চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারের মধ্যে আত্তং, চাক, আশো, বম, গারো, হালাম, হাকা, খুমি, কোচ, কক্‌বরক, মারমা, মেগাম, মৈতৈ মণিপুরী, ম্রো, পাংখোয়া ও রাখাইন অন্যতম। ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে- অহমিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, চাকমা, হাজং (পূর্বে তিব্বতি-বর্মি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল), সাদরি (ওরাং), তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি। দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দুটো ভাষা হলো– কুড়ুঁখ ও শাউরিয়া পাহাড়িয়া।

ভাষার অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশকে ১১টি অঞ্চলে বিভাজন করা যায়: (১) বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল– ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর ইত্যাদি, (২) গাজীপুর, (৩) উপকূলীয় অঞ্চল– পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার, (৪) বৃহত্তর সিলেট– সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ অঞ্চল (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম– রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, (৬) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল– যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা, (৭) উত্তরবঙ্গ– রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর, (৮) বৃহত্তর চট্টগ্রাম– চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার, (৯) বৃহত্তর কুমিল্লা– চাঁদপুর ও কুমিল্লা, (১০) রাজবাড়ী এবং (১১) ফরিদপুর।

অঞ্চল	নৃগোষ্ঠীয় জাতি বা ভাষা		
(১) বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল– ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর ইত্যাদি	গারো হাজং কোচ	বর্মন ডালু হদি	বানাই রাজবংশী
(২) গাজীপুর	বর্মন	কোচ	গারো

অঞ্চল	নৃগোষ্ঠীয় জাতি বা ভাষা		
(৩) উপকূলীয় অঞ্চল– পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার	রাখাইন		
(৪) বৃহত্তর সিলেট– সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ অঞ্চল	মণিপুরী খাসি গারো	হাজং পাত্র খাড়িয়া	সাঁওতাল ওরাওঁ ত্রিপুরা
(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম– রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	অহমিয়া চাকমা মারমা ত্রিপুরা বম	লুসাই তঞ্চঙ্গ্যা ম্রো গোর্খা চাক	পাংখোয়া খুমি সাঁওতাল গারো খ্যাং
(৬) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল– যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা,	বাগদি (বুনো)	রাজবংশী	সাঁওতাল
(৭) উত্তরবঙ্গ- রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর	সাঁওতাল ওরাঁও মুন্ডা মালো মাহালি খণ্ড	বেদিয়া ভূমিজ কোল টুরি বিল কর্মকার মাহাতো	মুরিয়ার মুশহর পাহান পাহাড়িয়া রাই সিং
(৮) বৃহত্তর চট্টগ্রাম– চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	চাকমা	মারমা	ত্রিপুরা
(৯) বৃহত্তর কুমিল্লা– চাঁদপুর ও কুমিল্লা	ত্রিপুরা		
(১০) রাজবাড়ী	ত্রিপুরা		
(১১) ফরিদপুর	ত্রিপুরা		

সূত্রঃ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২০০২, টেরি ডারনিয়ান ২০০৭, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ২০১৩

বাংলাদেশের এসব নৃগোষ্ঠীয় জাতিগুলোর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে। তবে অধিকাংশ ভাষারই নিজস্ব লিখিত রূপের প্রচলন রয়েছে। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন ইত্যাদি ভাষা নিজস্ব লিপিতে লেখা হয়। কক্‌বরক (ত্রিপুরাদের ভাষা), বম, লুসাই, পাংখোয়া, গারোসহ কয়েকটি ভাষা রোমান লিপিতে লেখা হয়। বাংলায় লেখা হয় সাদরি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীসহ কয়েকটি ভাষা। লিপি বিতর্কের মধ্যে রয়েছে সাঁওতালদের ভাষা। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা, রোমান ও অলচিকি লিপিতে সমান্তরালে লেখালেখির ব্যবস্থা প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি এই ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে চাইলে এককভাবে বাংলা নাকি রোমান লিপিতে লেখা হবে, এ নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি সাঁওতাল নেতৃবৃন্দ।

ভাষা বিকাশের অন্যতম উপায় হলো লিখিত ও অলিখিত– উভয় ধারাতেই ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার। বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীয় ভাষাগুলো দীর্ঘদিন ধরে মৌখিক সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গানে, কবিতায়, ছড়ায়, ছন্দে এসব ভাষার বিকাশ ঘটেছে, রচিত হয়েছে সেসব ভাষাভাষী মানুষের কালের ইতিহাস। কিন্তু কালে কালে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির চাপ ও আধুনিকতা নামের দ্রুত ধাবমান দানবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সব নৃগোষ্ঠীয় ভাষার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই নানা ভাষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অনেক ভাষা হারিয়ে ফেলতে থাকে তার নিজস্ব রূপ ও জৌলুস। অনুপ্রবেশ ঘটে অন্যান্য ভাষার অনুষঙ্গ। স্বাভাবিক বিকাশের ধারায় গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া না হওয়ায় অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষাই হারিয়ে ফেলে। দীক্ষা নেয় ভিন্ন ভাষা পরিবারের নতুন মন্ত্রে। ভোট-বর্মি ভাষা পরিবারের অনেক জাতিগোষ্ঠী এখন রীতিমতো ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারের প্রভাবশালী সদস্যে পরিণত হয়েছে। লিখিত চর্চার অনুপস্থিতি বা সীমিত সুযোগের কারণে অনেক ভাষার এই পরিণতি হয়েছে বলে ভাষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

অন্যদিকে লিখিত চর্চারও আনুষ্ঠানিক কোনো সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতা নৃগোষ্ঠীয় ভাষাগুলো পায় না। নৃগোষ্ঠীয় ভাষা-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রকাশনা ও সাহিত্যকর্মই ব্যক্তিগত উদ্যোগ অথবা ক্লাব-সমিতিকেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকেও নৃগোষ্ঠীয়দের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা বের হয়। কিন্তু অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় এসব ভাষার ব্যবহার সরকারি পৃষ্ঠপোষণ ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় নৃগোষ্ঠীয় ভাষাগুলোর ব্যবহার বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমলেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে তা আজ ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন শুরু হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষাসহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র বাংলাই প্রচলিত হয়। শ্রেণিকক্ষে নৃগোষ্ঠীয় ভাষাসহ সকল আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার না করার নিয়ম প্রচলন করা হয়। ফলে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়ে বাংলা ভাষার সংস্পর্শে না আসা প্রত্যন্ত অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর শিশুরা। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির আগেই ঝরে পড়তে থাকে তারা। ক্লাসের পড়ায় অমনোযোগিতা, অনিয়মিত উপস্থিতি, পরীক্ষায় অকার্যকারিতাসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও দেখা দেয় নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাঝে। এসব প্রেক্ষাপট অনুধাবন করে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করার বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়। এই চুক্তির পরবর্তী সময়ে গৃহীত বিভিন্ন আইনি দলিলগুলোতেও এই বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর আইনসমূহ ১৯৯৮, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

('পিইডিপি-২'), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ইত্যাদি সরকারি নীতি ও কৌশলপত্রেও নৃগোষ্ঠীয় শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে 'Primary Education Situational Analysis, Strategies and Action Plan for Mainstreaming Tribal Children' নামের একটি বিশেষ পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে জনগোষ্ঠীভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের জন্যে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা, নৃগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের স্কুলে গমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিফিন ব্যবস্থার মতো বিশেষ সুবিধা বা স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তি ও অবস্থান নিশ্চিত করার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নমনীয় স্কুল ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা– যেখানে নৃগোষ্ঠীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবিকাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সন্নিবেশ করে সহপাঠক্রমিক শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন করা ইত্যাদি। 'পিইডিপি-২'র পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ('পিইডিপি-৩')-তেও পূর্বের পরিকল্পনাগুলো ঠিক রেখে আরো কিছু নতুন পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়।

নৃগোষ্ঠীয় মাতৃভাষা সুরক্ষায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিকস্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি। ব্যাকরণগত কিছু ব্যত্যয়ের কারণে সমালোচিত হওয়া ছাড়া আইনি ভিত্তি হিসেবে এই শিক্ষানীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ২০১০ সালে প্রণীত এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতি হিসেবে নৃগোষ্ঠীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা(য়) শিখতে পারে সেজন্যে নৃগোষ্ঠীয় শিক্ষক নিয়োগ ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নৃগোষ্ঠীয় লোকদেরকে সম্পৃক্ত করা, নৃগোষ্ঠীয় এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রাথমিকস্তরে নৃগোষ্ঠীসহ সকল জাতিসত্তার জন্যে স্ব স্ব মাতৃভাষা(য়) শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা, যেসব এলাকায় হালকা জনবসতি রয়েছে প্রয়োজন হলে সেসব এলাকার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং এলাকার জীবন-জীবিকা ও মৌসুম অনুসারে নমনীয় স্কুলপঞ্জিকা নির্ধারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পথরেখা অনুসরণ করে নানা প্রতিকূল পথ পাড়ি দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৯ সালে বাংলার দামাল ছেলেদের সেই আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং ২০০০ সাল থেকে দিবসটিকে পৃথিবীর প্রায় ২০০টি সদস্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উদ্‌যাপন শুরু করে। এই ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সারা পৃথিবীর

বুকে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষী জনগণের জন্য এই ঘোষণা একটি দায়বদ্ধতাও তৈরি করে দেয়। কারণ, রাষ্ট্রভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিপরীতে স্থানীয় বা অন্যান্য প্রান্তিক ভাষার বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় নেয়াটাই ভাষা-সুবিচার বা ভাষা-ন্যায্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে বাংলাভাষীদের ভাষাপ্রীতি বিশ্বের অন্য সকল ভাষার মানুষদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। তাই রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বসবাসকারী সর্বদিক থেকে প্রান্তিক এই সংখ্যায় কম জাতিসত্তাগুলোর নিজেদের ভাষা সংরক্ষণ বা বিকাশের দাবিগুলোও আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রতি একজন বাংলাভাষী মানুষের যে দরদ, সে দরদ একজন নৃগোষ্ঠীয় ব্যক্তির মধ্যেও সমানভাবে বিরাজ করা স্বাভাবিক। কোনো ভাষা সংরক্ষণ বা বিকাশের জন্য 'চর্চা'র বিষয়টিই মুখ্য। চর্চা ছাড়া ভাষার বিকাশ ও সংরক্ষণ কোনোটাই সম্ভব নয়। তাই বেসরকারিভাবে হলেও অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার জন্যে নানামুখী উদ্যোগ নিয়ে চলেছে।

শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত হয় মাতৃভাষায়। সে শিক্ষা আরও শাণিত হয় যদি তার বিষয়বস্তু হয় তার পারিপার্শ্বিক ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাতৃভাষাই শিশুকে তার পরিবেশ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। এ ভাষায় সে তার অভাব, চাহিদা ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করে, তার আনন্দ, ভালো-লাগা তার বেদনা অন্যকে জানায়। মাতৃভাষা যে একটি শিশুর কেবল ভাব প্রকাশের বাহন তা নয়, বরং এর মাধ্যমে সে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ করে। মাতৃভাষা শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে তার পরিচয় ও ধারণার সীমানাকে ক্রমসম্প্রসারিত করে। তার চারপাশে অনেক নতুন ও অচেনা বস্তু ও শব্দের আনাগোনা চলতে থাকে। এসব কিছুর মধ্যে তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-বেদনা, জ্ঞান-জিজ্ঞাসা মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। মাতৃভাষার উপর ভর করেই মানবশিশু ক্রমে অন্য ভাষার সঙ্গে সার্থক সংযোগ স্থাপন করে। এভাবেই নিজের জানা জগতের গণ্ডি পেরিয়ে একটি শিশু ক্রমে অজানা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে।

মাতৃভাষার এই গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ২০১২ সাল হতে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে দেশের নৃগোষ্ঠীয় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাকার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৩১শে অক্টোবর ২০১২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব এম এম নিয়াজউদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রথমবারের মতো একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়– যেখানে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভায় একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সৈয়দ আশরাফুল

ইসলামকে আহ্বায়ক করে একটি স্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে একটি টেকনিক্যাল কমিটি, একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কমিটি এবং ভাষাভিত্তিক লেখক কমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিকপর্যায়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরি ও সাঁওতাল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে পর্যায়ক্রমে সকল ভাষায় অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনাও হাতে রাখা হয়।

সরকারি এই উদ্যোগে এমএলই ফোরামকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, এমএলই ফোরাম হলো নৃগোষ্ঠীয় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সম্মিলিত একটি জোট। এমএলই ফোরাম এর সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়ায় সরকারকে সহায়তা করে থাকে। সরকারি এই কর্মযজ্ঞে প্রাথমিকভাবে ৬টি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাঁওতালরা তাদের বর্ণমালার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে না পারায় শেষপর্যন্ত তাদের ভাষায় শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়ন প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়। তাই ১৪ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এমএলই বিষয়ক সরকারের জাতীয় কমিটির সভায় আপাতত ৫টি ভাষায় উপকরণ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ম্রো, মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া), মণিপুরী (মৈতৈ), তঞ্চঙ্গ্যা, খাসি ও বম; তৃতীয় পর্যায়ে কোচ, কুড়ুক (ওঁরাও), হাজং, রাখাইন, খুমি ও খ্যাং ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাষাগুলোও প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহার করা হবে বলে আশা করা যায়।

নৃগোষ্ঠীয় শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করার টার্গেট করা হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। এরপর ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে তা শুরু করার জন্য আবারও টার্গেট করা হয়। কিন্তু এবারও এই উদ্যোগ আলোর মুখ দেখেনি। তারপর আমাদের সামনে টার্গেট হিসেবে এসে দাঁড়ায় জানুয়ারি ২০১৬। এবার কিন্তু আমাদের আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিগত ২৬ থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে জাতীয়ভাবে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে ইতোমধ্যে এমএলই ব্রিজিং প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে কয়েক দফায় পাঁচ নৃগোষ্ঠীয় ভাষার লেখক-গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত লেখক প্যানেলের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল প্রণীত উপকরণসমূহের যৌক্তিকতা যাচাই কর্মশালা, উপকরণ প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে মাঠে ছেড়ে দেওয়া বা স্কুল পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা। কিন্তু জানুয়ারি খুব দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা এখনো শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে পারিনি। অন্তত এই বছরের জুলাই মাসের মধ্যে যদি আমরা পরীক্ষামূলক সংস্করণটি প্রকাশ করতে না পারি, তাহলে প্রজন্মের কাছে আমরা কোনো জবাবদিহি করতে

পারব না। নৃগোষ্ঠীয় জাতিগুলো এখনো পথ চেয়ে রয়েছে, কখন আলোর মুখ দেখবে বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত সেই মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকার।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল নৃগোষ্ঠীয় জাতিগুলোর এই অপেক্ষার একটি সফল সমাপ্তি রেখা টানতে সক্ষম হবেন। নৃগোষ্ঠীয় জাতিগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো যেন আলো-আঁধারি পথরেখায় হারিয়ে না যায়- এই কামনাই করি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট : ঢাকা থেকে প্যারিস

মোঃ মনজুর হোসেন*

০৭ নভেম্বর, ২০১৫, ইউনেস্কো সদর দপ্তর, প্যারিস, ফ্রান্স; ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩৮তম অধিবেশনে শিক্ষাবিষয়ক কমিশনের সভা চলছে ২নং কক্ষে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের (বিএনসিইউ) চেয়ারম্যান জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.-র নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অধীর আগ্রহ নিয়ে শিক্ষাবিষয়ক কমিশনের সভায় অংশগ্রহণ করছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের আজ আরও একটি স্বপ্ন পূরণের দিন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কোর ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে ইউনেস্কো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! প্যারিস সময় সকাল ১০:৪৭ মিনিট। ৩৮তম সাধারণ সভার আলোচ্যসূচির ১৬নং ক্রমিকের বিষয়বস্তু– ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কোর ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাবটি সভার সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত হলো। কোনো বিতর্ক ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষাবিষয়ক কমিশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। আনন্দে, উত্তেজনায় চোখের কোণে কখন যে এক ফোঁটা পানি চলে এসেছে, তা টেরই পাইনি। সত্যিই, এ এক স্বপ্ন পূরণের দিন! সম্বিত ফিরে পেলাম যখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আহ্বান জানানো হলো কিছু বলার জন্য। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা ইউনেস্কোর মহাপরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে তাদের সমর্থনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। এই বিশেষ ক্ষণে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীই উপযুক্ত ব্যক্তি; কেননা এ প্রক্রিয়াটি তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল এবং সফল সমাপ্তিও হলো তাঁর উপস্থিতিতে।

তবে এ সাফল্য একদিনে আসেনি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের ১৫ মার্চ যেদিন তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র এবং দৃষ্টিনন্দন রমনা পার্কের পূর্বপাশে সেগুনবাগিচায় ১.০৩ একর জমির উপর ১২তলা ভবনবিশিষ্ট এ ইনস্টিটিউটটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এরও আগে ১৯৯৮ সালে

*সচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

কানাডাপ্রবাসী প্রয়াত জনাব রফিকুল ইসলাম এবং জনাব আব্দুস সালামসহ আরও সাতটি ভাষা-ভাষীর মোট ১০ জনের সমন্বয়ে গঠিত ফোরাম মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে ও নির্দেশনার ফলে বাঙালি জাতির অহংকার এবং গর্বের মহান শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৩০তম অধিবেশনে। কাজেই আমাদের মহান শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজের জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত আনন্দের এবং সম্মানের।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ধারণাটি সর্বপ্রথম ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে আহ্বায়ক ও বিএনসিইউর সচিবকে সদস্য-সচিব করে ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের একজন প্রতিনিধি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন)-কে নিয়ে ৪-সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করে ইউনেস্কোতে প্রেরণ করে ২০১৩ সালের ৭ মে। এরপর ইউনেস্কোর চাহিদা অনুযায়ী মূল প্রস্তাবনার পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং ইউনেস্কো মহাপরিচালক কর্তৃক প্রেরিত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আগত প্রতিনিধিদলের কার্যক্রমে (৪-৬ নভেম্বর, ২০১৪) সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ইউনেস্কো কর্তৃক এ প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়া পর্যন্ত দেশে এবং বিদেশে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, শিক্ষাসচিব এবং ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এম. শহীদুল ইসলাম অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত বাংলাদেশ, ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডের অন্যতম সদস্য হওয়ায় এর বোর্ড সভায় এবং ইউনেস্কো মহাপরিচালকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব চৌধুরী উপস্থিত থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভের প্রসঙ্গটি তিনি উত্থাপন করতেন। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে তাঁর তাৎক্ষণিক নির্দেশনা বাংলাদেশের পক্ষে গৃহীত কার্যক্রমে গতি আনতে প্রভূত সহায়ক হয়।

২০১৩ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনে সচিব হিসেবে যোগদানের অব্যবহিত পর থেকে এ যাত্রাপথে সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায় থেকে আমরা অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকলের সমর্থন ও সহযোগিতায় ৩৮তম সাধারণ সভার পূর্বে ৮-২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৭তম নির্বাহী বোর্ড

সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিএনসিইউর চেয়ারম্যান এবং শিক্ষাসচিব ও বিএনসিইউর মহাসচিব এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বদাই নিবিড়ভাবে তদারকি করেছেন ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মচারিবৃন্দ এবং এ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের আন্তরিকতা ও যথাযথ দায়িত্বপালনের কারণে আমাদেরকে পূর্বপরিকল্পনার কোনো পর্যায়েই হোঁচট খেতে হয়নি, তা স্বীকার না করে পারছি না। ২০১৩ সালেই আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম যে, প্রক্রিয়া যতই দীর্ঘ হোক না কেন, ২০১৫ সালের নভেম্বরের ৩৮তম সাধারণ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের জন্য আমরা ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২-এর স্বীকৃতি অর্জন করবো, ইনশাআল্লাহ। ফলত এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলের সমন্বিত চেষ্টা ও প্রয়াস এ অর্জনকে সম্ভব করে তুলেছে। ইউনেস্কোর এ স্বীকৃতি মহান শহীদ দিবসে আমাদের ভাষাসৈনিকদের অবিস্মরণীয় অবদান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার এক বিশাল সুযোগ করে দিয়েছে।

তবে এখনও যেতে হবে অনেক দূর! মহান ভাষাশহীদদের স্বপ্ন ও ইতিহাসকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে। আশা করা যায়, সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় এ অভিযাত্রাও সফল হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের এ নব যাত্রাক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু এবং ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভাকে– তাঁর অকুণ্ঠ ও আন্তরিক সমর্থনের জন্য। আর গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি, সকল ভাষাশহীদ ও ভাষাসৈনিকদের– যাঁদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও অতুলনীয় আত্মত্যাগে 'মা' শব্দটি এখনও আমাদের।

পরিশেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ, জাতি ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে এমন এক বিশ্ব গড়ে তোলা যেখানে মানবিক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন থাকবে, দূরীভূত হবে সব ধরনের বৈষম্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সে-অর্থে একটি রূপকল্প, অভিধামুক্ত তাৎপর্যে বিশিষ্ট। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এর ইউনেস্কো-র ক্যাটেগোরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন একুশের চেতনা বাস্তবায়নে গতির সঞ্চার করবে।

প্রাককথন

ব্রিটিশ ভারত ১৯৪৭ সনে বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়– পাকিস্তান ও ভারত। পাকিস্তানের দুটি প্রদেশ– পূর্ববাংলা ও পশ্চিমপাকিস্তান। পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বাস পূর্ববাংলায়। বৃহত্তর জনগণের অভিমতকে শ্রদ্ধা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি। কিন্তু পূর্ববাংলার সংখ্যাগুরু মানুষের সে-অধিকার পাকিস্তানি শাসকচক্র শুধু হরণই করেনি, আমাদের স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করেছিল। তাদের আচরণ ও দুরভিসন্ধির সঙ্গে কেবল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতা ও আচরণের তুলনা চলে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের আগ্রাসনে ধ্বংস হয়েছে আজটেক সভ্যতা, হারিয়ে গেছে মায়া-সহ বহু সভ্যতা ও ভাষা। বিদেশি শাসকেরা আফ্রিকায় শুধু গণহত্যা করেনি; নির্বিচারে কালো মানুষদের ভাষাকে হত্যা করেছে। পূর্ববাংলার অধিবাসীরা নতুন রাষ্ট্র-পরিচয় লাভের মাত্র দু-বছরের মধ্যেই বিপন্ন অভিজ্ঞতায় আর্ত হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সনে তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তাদের শুনতে হয় শাসকচক্রের ভাষিক সাম্রাজ্যবদী ঘোষণা : উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ভাবতে অবাক লাগে, এ জাতীয় ঘোষণার জন্য কোনো জনমত জরিপ করা হয়নি। কী কারণে এ ফরমান জারি তাও পূর্ববাংলাবাসীদের জানা ছিল না। কিন্তু এক অনিবার্য সত্য উপলব্ধিতে তাদের বিলম্ব হয়নি। তারা বুঝেছিল যে, এক দুর্দৈব নেমে আসছে। নীলনকশা বাস্তবায়িত হলে তারা মাতৃভাষার অধিকার হারাবে, হাজার বছরের চর্চিত সংস্কৃতি থেকে

*মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউট

শুধু তারা নয়, তাদের পরবর্তী বংশ পর্যন্ত বঞ্চিত হবে। মায়ের ভাষার চিরায়ত সম্পদ পাঠে তাদের অধিকার থাকবে না। এভাবে নিরস্তিত্ব ও বীতপরিচয় হয়ে টিকে থাকা যায় না। এ অবস্থায় একটি পথই খোলা, মরণপণ সংগ্রাম করে নিজেদের জাতিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং তা প্রতিষ্ঠিত করা। তারা সেভাবেই অগ্রসর হয়েছে। প্রথম প্রতিবাদ করে ছাত্ররা। ক্রমান্বয়ে তা আন্দোলনে পরিণত হয়, ছড়িয়ে যায় দেশের সর্বত্র। ভাষা-আন্দোলনে যুবসমাজের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠেন দেশের সুশীলসমাজ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ – শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী-সহ তৎকালীন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে (১৯৫২) এক অনন্য ইতিহাস তৈরি হয়। বাংলার ছেলেরা মাতৃভাষার জন্য রক্ত দেয়, শহীদ হন সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর-সহ অনেকে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে এক জায়গায় বলেছেন: *আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।*– তাঁর এ উক্তি অভিজ্ঞতা-নিষিক্ত প্রত্যয়ের শব্দরূপ। কোনো জাতি যখন মরতে শেখে, তখন সে-জাতির অগ্রযাত্রাকে সাময়িকভাবে বিলম্বিত করা গেলেও কোনোভাবেই তা প্রতিহত করা যায় না।

একুশ ছড়িয়ে যাক সবখানে

বাঙালির মাতৃভাষা ও স্বকীয় পরিচিতি অর্জনের ইতিবৃত্ত বিশ্বে প্রসারিত হোক – এ প্রত্যয় আমাদের অনেকের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। এক্ষেত্রে গফরগাঁও থিয়েটারের সংগঠকবৃন্দ, প্রকৌশলী এম এনামুল হকের কথা বলা যায়। কিন্তু এসবই ছিল সীমিত পরিসরে, নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে। এ প্রবাহ ক্রমান্বয়ে তরঙ্গায়িত ও দেশজ বৃত্তের বাইরে প্রসারিত হয়। কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠীকে তা স্পর্শ করে। এ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাত ভাষার দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে দু-জন ছিলেন বাঙালি – মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম। সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আননকে পত্র প্রেরণ (২৯ মার্চ ১৯৯৮) করা হয়। এ চিঠিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালি জাতির অনন্য ও অভূতপূর্ব ভূমিকা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বের অনেক জাতি ও সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা সংকটাপন্ন এবং এসব ভাষার বিকাশ-প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রতিকূল। এ অবস্থায় জাতিসংঘের অন্য সব দিবসের মতো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হলে সেই উদাহরণ বিশ্বের সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে প্রেরণা যোগাবে। চিঠি পাঠানোর পর প্রায় এক বছর গড়িয়ে যায়। কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। রফিকুল ইসলাম অতঃপর ফোন করেন ইউনেস্কো সদর দপ্তরে, ভাষা-বিভাগের কর্মকর্তা আন্না মারিয়া মেজলোক-কে। পত্রপেরকদের আবেগ ও প্রেরণা তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। তিনি দুটি নির্দেশনা দেন – [এক] প্রস্তাবটি গ্রহণে ইউনেস্কো-র বোর্ড-সদস্যবৃন্দকে আগ্রহী হতে হবে; [দুই] এ জাতীয় প্রস্তাব ব্যক্তিগতভাবে উপস্থাপনের সুযোগ নেই, তা অবশ্যই সদস্য-রাষ্ট্রের মাধ্যমে উত্থাপিত হতে হবে। ইউনেস্কো-কর্মকর্তা

বাংলাদেশসহ কয়েকটি সদস্য-রাষ্ট্রের নামও জানিয়ে দেন।

সরকারের সদিচ্ছা ও ত্বরিৎ উদ্যোগ গ্রহণ

রফিকুল ইসলাম করণীয় নির্ধারণে বিলম্ব করেননি। তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানান যে, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব ১০ ডিসেম্বর (১৯৯৯)-এর মধ্যে অবশ্যই ইউনেস্কো কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। তখন সরকার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। সময় ছিল মাত্র ৪৮ ঘণ্টা। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বুঝেছিলেন যে, স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় এতো স্বল্প সময়ে সবকিছু অনুমোদন করিয়ে ইউনেস্কো-তে প্রস্তাব পাঠানো যাবে না। এ অবস্থায় একমাত্র ভরসা ও আশ্রয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই সবকিছু নির্ধারণ করা হয়। প্রস্তাব পাঠানো (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) হলো ইউনেস্কো সদর দপ্তরে। ইউনেস্কো-র নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন ও ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে তা উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়, বিশেষত বাজেট বরাদ্দ ও সম্ভাব্যতা যাচাই ইত্যাদি উঠে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সবকিছু অতিক্রম করা সম্ভব হয়। ইউনেস্কো-র মহাপরিচালক ঘোষণা করেন: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রস্তাব গৃহীত হবে এবং তা উপস্থাপিত হবে পরিচালনা পরিষদের ১৬০তম অধিবেশনে। সবশেষে এল প্রত্যাশিত সেই দিন, ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯। বাংলাদেশের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করল। ১৯৫২ সনে মাতৃভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন সেই সব শহীদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হলো। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের এ প্রস্তাবের সহ-উপস্থাপক ছিলেন সৌদি আরব আর তা সমর্থন করে যেসব দেশ সেগুলি হলো, যথাক্রমে– আইভরি কোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ওমান, ফিলিপাইন, বাহামাস, বেনিন, বেলারুশ, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেশিয়া, মিশর, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, শ্রীলংকা, সিরিয়া ও হন্ডুরাস। বস্তুত, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণবিসর্জন বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বাঙালি জাতি সে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে; আর সকল ভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও তার বিকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রেরণা সঞ্চারিত করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন শেখ হাসিনা। বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে তিনি যথার্থই মাতৃভাষা অনুরাগী। বিশ্বের সকল ভাষিক সম্প্রদায় তাঁকে স্মরণে রাখবে, শ্রদ্ধা জানাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হলে দেশবাসীর মধ্যে অসাধারণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এ উপলক্ষে পল্টন ময়দানে সভা আহ্বান করা হয় (৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯)। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশাল জনতার উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্ত-প্রায় ভাষাগুলির সংরক্ষণ,

মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ধীকল্প একান্তই তাঁর; তিনিই এর জনয়িত্রী।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভবননির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচা (ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী)–য় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্নের পর ৬ মে ২০০৩-এ মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী তা সমাপ্ত হয়নি। ২০০৩ সনে এ কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং তা দীর্ঘায়িত হয় ৫ বছর ৩ মাস। এরপর প্রকল্প সংশোধনসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ২০১০-এ। এ বছরই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন করেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কোনটি জাতীয় কাজ আর কোনটি সরকারি কাজ – আমরা তা অনেক সময় বুঝি না, বুঝলেও মানি না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তাতে পরোক্ষে মঙ্গলই হয়েছে। জাতির প্রতি যাঁর সংবেদনা অপার, আমাদের জাতীয় ঐক্যের যিনি প্রতীক, সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করাই যাঁর প্রেরণা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় যাঁর অবদান অনিঃশেষ, যিনি ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, সেই ভবনের দ্বার-উদ্ঘাটন, উদ্বোধনের অধিকার কেবল তাঁরই এবং এটাই তো স্বাভাবিক।

ভবন নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয় ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে। এপর্যায়ে আরো তিনটি তলা নির্মিত হচ্ছে। বর্তমান অর্থ-বছরে এ কাজ সমাপ্ত হবে। ইতিমধ্যে অডিটোরিয়ামের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ২০১৫-এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা উদ্বোধন করেছেন। বিভিন্ন তলার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। বর্তমানে নকশা অনুযায়ী এসব তলার আনুষঙ্গিক কাজ অব্যাহত আছে। আশা করা যায়, নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন হবে। তৃতীয়পর্যায়ে ইনস্টিটিউট ভবন পূর্ণরূপে নির্মাণের প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে।

কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, মাতৃভাষার কবিতাপাঠ, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। ইনস্টিটিউট থেকে নিউজলেটার *মাতৃভাষা-বার্তা*, দুটি ষাণ্মাসিক বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা *মাতৃভাষা* ও মাদার ল্যাংগুয়েজ প্রকাশিত হচ্ছে। পরিচালিত গবেষণাকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা*। বর্তমান

অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হবে। এ গবেষণায় বাংলাদেশের মাতৃভাষা পরিস্থিতি ও ভাষিক সম্প্রদায়ের অবস্থান বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

ইউনেস্কো-র ক্যাটেগোরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ

আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভের জন্য আবেদন করা হয়। সে-অনুযায়ী ইউনেস্কো-র পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ০২ থেকে ০৪ নভেম্বর ২০১৪ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ছাড়াও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সুশীলসমাজ ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধিবর্গের প্রদত্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ইউনেস্কো-র ১৯৭তম নির্বাহী বোর্ড সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো-র ক্যাটেগোরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ১২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ক্যাটেগোরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাদানের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে ফ্রান্সে নিযুক্ত আমাদের রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম ও ইউনেস্কো-র পক্ষে সহকারী মহাপরিচালক (শিক্ষা) কিয়ান তান স্বাক্ষর করেন। এই প্রথম এ দেশের একটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। এর ফলে এ ইনস্টিটিউটের কর্মপরিধিও প্রসারিত হলো। ইউনেস্কো-র সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ৬-ধারায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও কার্যাবলি উল্লেখ করে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে: প্রথমত, মাতৃভাষার উন্নয়ন ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রম প্রবর্তনে সহযোগিতা করা; এবং দ্বিতীয়ত, বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্বের মাতৃভাষাগুলির সংরক্ষণ ও সেগুলির উন্নয়ন সাধন করা। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাগ্রসর। কেননা, ১৯৯৯ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তার মধ্যেই এসব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল তা এখন বাস্তবনিষ্ঠ রূপ পেয়েছে। অচিরকালের ব্যবধানেই মাতৃভাষা সংরক্ষণসহ সকল ভাষিক সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে আর এভাবেই এর রূপকারের স্বপ্ন সার্থক ও এর পরিচয় বিশ্বে প্রসারিত হবে, একুশের চেতনা জড়িয়ে যাবে সবখানে।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ও অন্যান্য

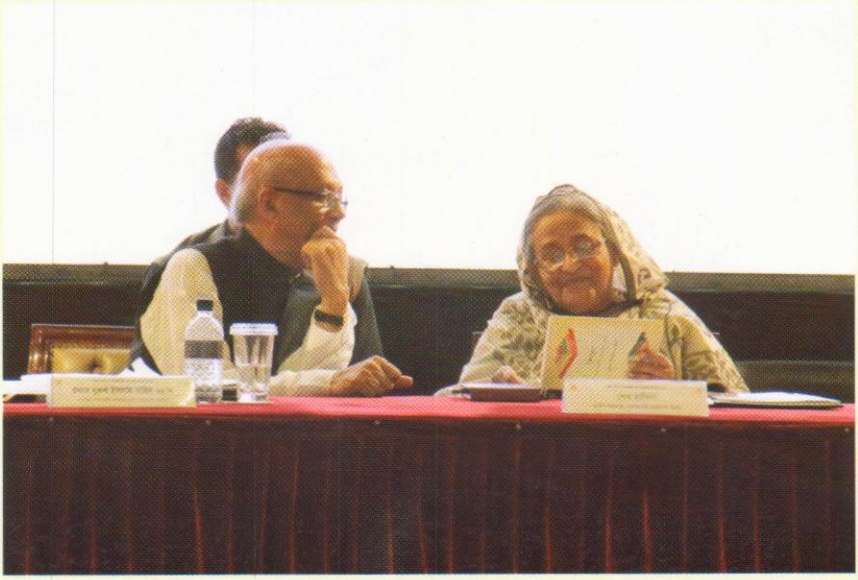

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলাপরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

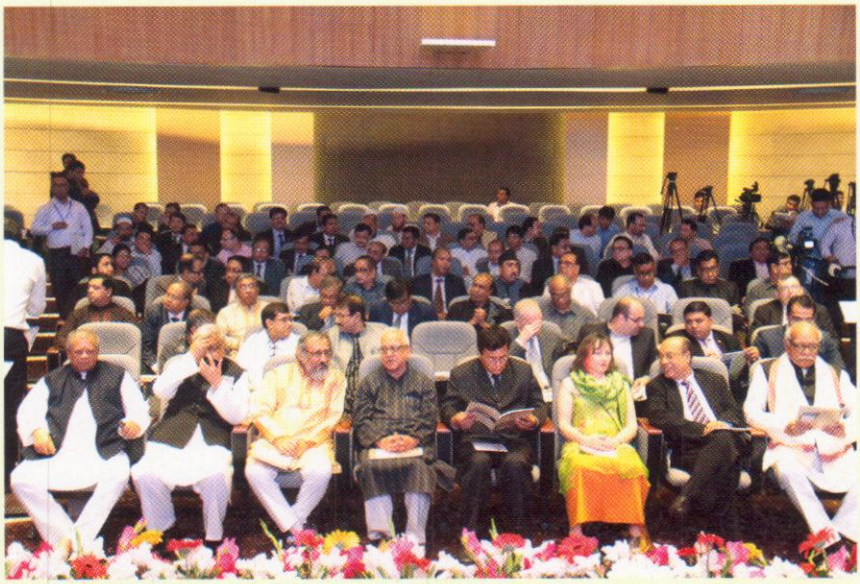

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথিবৃন্দের একাংশ

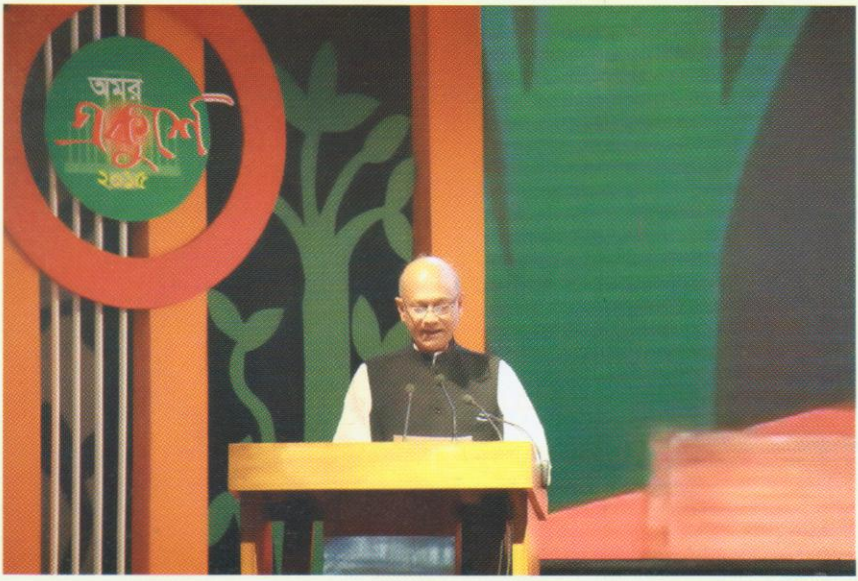

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫-এর সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন
জনাব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
অনুষ্ঠানমালায় উপস্থিত সুধী ও দর্শকবৃন্দের একাংশ

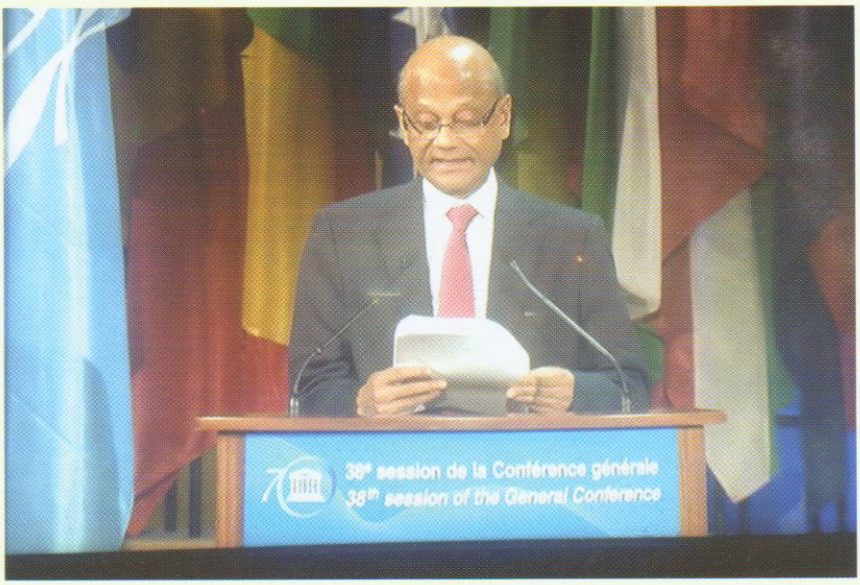

ইউনেস্কোর ৩৮তম জেনারেল কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট 'ইউনেস্কোর ক্যাটিগরি ২' প্রতিষ্ঠান ঘোষণার চুক্তিপত্র বিনিময়ে ইউনেস্কোর সহকারী মহাপরিচালক (শিক্ষা) মি. কিয়ান তাং এবং বাংলাদেশের পক্ষে ফ্রান্সে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম

ইউনেস্কোর ১৯৭তম নির্বাহী বোর্ড সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত
জনাব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায়
অভ্যাগতদের স্বাগত জানাচ্ছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশি-বিদেশি শিশুদের একাংশ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার;
সঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ এস মাহমুদ, মহাপরিচালক ও সৈয়দ আবুল বারক আল্‌ভী

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃতরতা স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ

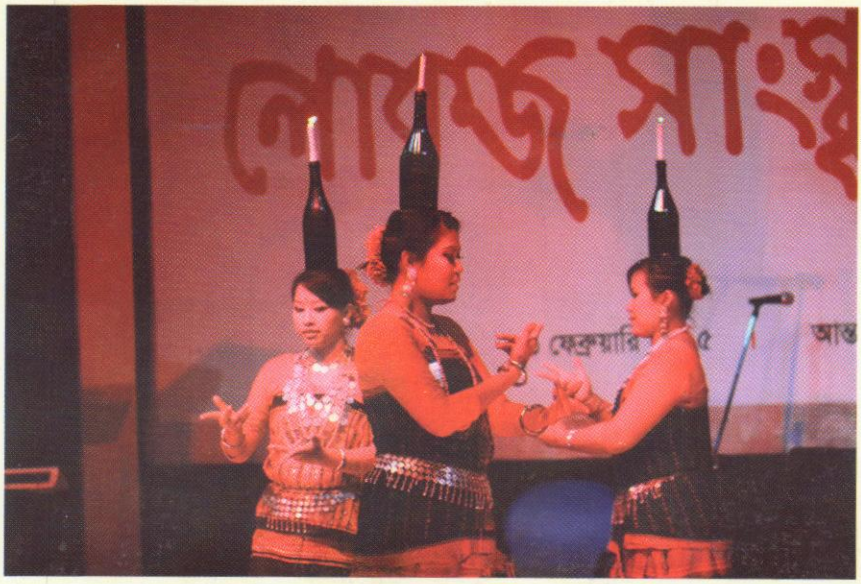

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃতরতা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটের
নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করছেন। সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউট ভবন (সম্মুখ ভাগ)